The Female Mind

নারীর মন

প্রথম খণ্ড

নারী মনস্তত্ত্বের রহস্যময় দিকগুলি
নিয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী তত্ত্বীয় গ্রন্থ

এস.এম. জাকির হুসাইন

রোহেল পাবলিকেশনস্
ঢাকা

নারীর মন

[প্রথম খণ্ড]

এস.এম. জাকির হুসাইন

Chief Knowledge Organizer (CKO)

SS Knowledge Club

রোহেল পাবলিকেশন্‌স

৩৮/২ক, বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০।

ফোনঃ ৭১৭৫৩২৪, মোবাঃ ০১৭১৬-৫৫৫৫৮০

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় অগ্রজ,

পরমাণুবিজ্ঞানী, মরহুম ড. শহীদুল্লাহ্ মৃধার জন্য।

তাঁর কাছ থেকে আমি যে প্রেরণা

পেয়েছি তার ঋণ আমি কোনোদিন

শোধ করতে পারব না, স্বীকার করব শুধু।

সূচিপত্র

এস. এম. জাকির হুসাইনের 'অন্ধকারে বস্ত্রহরণ' বইটি সম্পর্কে একটি অভিমত

ডঃ শহীদুল্লাহ্ মৃধা, প্রাক্তন সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন, শৈলী পত্রিকায় (বর্ষ ৫ সংখ্যা ৮, জুন ১, ১৯৯৯) "একটি অসাধারণ পুস্তক পাঠের আনন্দ" শিরোনামে এস.এম. জাকির হুসাইনের ***"অন্ধকারে বস্ত্রহরণ"*** (রোহেল পাবলিকেশন্স) নামক বইটির একটি সুদীর্ঘ রিভিউ প্রকাশ করেন। এখানে তার কিছু নির্বাচিত পংক্তি তুলে ধরা হলো: ....২০ কোটি বাংলাভাষীদের জন্য [এই জাতীয় বই] প্রকাশিত হয়েছে মাত্র একটি—বক্ষ্যমান বইটি। তবু ভালো এই যে বিংশ শতক শেষ হবার পূর্বেই একজন বাঙালি এমন একটি অপ্রচলিত ধারণার বই উপহার দিলেন। ....আমার ধারণামতে বাংলাদেশের বিদগ্ধমহলে একশতজন চিন্তাবিদ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ—যারা এই বইটির প্রতিটি চিন্তা-চেতনা অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন। ....এই বইটির প্রতিপাদ্য চিন্তাধারাগুলি যদি ব্যাখ্যা করতে হতো তাহলে এরকম ১০টি বই লিখতে হতো। ....আমাদের দুর্ভাগ্য বাংলা একাডেমী গত ২০ বছরে এমন একটি বই জাতিকে উপহার দিতে পারল না। বাঙালি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি নয় কোনো মতেই। তবে কোনোপ্রকারে যদি এই বইটি কোনো বুদ্ধিমান (বাঙালিমাত্র অবশ্যই বুদ্ধিমান তবে আইকিউ হাই নয়) চোখ বুজে কিনে নিয়ে (পৌনে তিনশত পৃষ্ঠার বইয়ের দাম ১৫০ টাকা, তাও কমিশন বাদে ১২০ টাকাতেই কেনা সম্ভব, শস্তাই বলতে হবে) পড়ে ফেলতে পারেন, দেখবেন আপনার জ্ঞান-চক্ষু বা ***তৃতীয় নয়ন*** খুলে গেছে চিরতরে। এটা আর বন্ধ হবে না কোনোদিন। আপনার মোক্ষলাভ ঘটবে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি।

ক্রস কানেকশান এবং আগ্রহের সূচনা

১

তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের সেমি-ফাইনাল ইয়ারে। এক দিন শ্রাবনের এক দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। হঠাৎ মনে পড়ল রিন্ডাকে ফোন করতে হবে। রিন্ডা রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই আরো দুটি গলার হ্যালো ভেসে এল। মুহূর্তেই বুঝে ফেললাম ক্রসকানেকশন। চুপ ক'রে রইলাম। রিন্ডাও চুপ ক'রে রইল। তারপর যে আলাপ শুনতে পেলাম তাকে মুটামুটি এভাবে সাজানো যায়:

"আহ, বলে ফেল তো শিউলি। কী এমন কথা থাকতে পারে যা বলার জন্য আমার কাছেও তোর আমতা আমতা করতে হবে।"

"আসলে মিতু, একটু আগে আমি ধর্ষিতা হয়েছি।"

"কী বললি?"

"হ্যাঁ। আমান এসেছিল। পথে–ঘাটে ও আমাকে উত্যক্ত করলেও, ভাবলাম বাসায় যখন এসেছে, তখন বসতে বলি। তাছাড়া ও বেশ সাহস দেখিয়েছে। মার্জিত আলাপ করি। বদমাশটা এমন সময়ে বাসায় এসেছে যখন বাসায় একটা কাক-পক্ষীও নেই। ভেবেছিলাম ওকে বসিয়ে দুটো ভালো কথা ব'লে বুঝিয়ে শুনিয়ে এক-কাপ চা খাইয়ে বিদায় করব। কিন্তু...."

"কিন্তু?"

"কিন্তু আমার কথা থেকেই ও বুঝতে পেরেছিল যে বাসায় কেউ নেই। আর তখনই এক কথায় দুই কথায় সরাসরি ভালোবাসার কথা—এটা ওটা, কত কি। এক পর্যায়ে গিয়ে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল।"

"আ! বলিস কী! ঐ সামান্য তালপাতার সেপাই। তারপর তোর নিজের ঘরেই।"

"ঠেকাতে পারিনি।"

“ এ কি তাজ্জব কথা শুনালি তুই, শিউলি? আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওর চেয়ে তোর গায়ে শক্তি বেশি। ওর কাছে কোনো অস্ত্র ছিল?”

“না।”

“তাহলে ঠেকাতে পারিসনি মানে?”

“একা মানুষ, ক’জনকে ঠেকানো যায়?”

“ক’জন মানে? ওর সাথে আর কে ছিল?”

“নিজেকে ঠেকাতো পারিনি।”

এর পর শিউলি নামের মেয়েটার চাপা কান্নার শব্দ শোনা গেল। হয়তো সে ভেবেছে টেলিফোনে কেঁদে রহস্যময় দুঃখমিশ্রিত অপরাধবোধকে বহু দূরে তাড়িয়ে দেয়া যাবে। ফলে সে ফোঁপানো থেকে আস্তে আস্তে ফাঁটতে শুরু করল। কিন্তু তার মিতু নাম্নী বান্ধবীটা হয়তো তার কান্না শুনতে পায়নি। সে সংবাদটা শুনেই কেবল ফোস ক’রে একটা অবাক-নিঃশ্বাস গিলে গুম্ হয়ে রইল। অনুমান করা গেল সে বিস্মিত হয়েছে—তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই একই সাথে এক জাতীয় রহস্যময় সুড়সুড়ি এবং মাংস-বেধা কষ্ট পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে নিথর হয়ে গেছে। সে যে তার বান্ধবীর টেলি-বিলাপ শুনতে পায়নি তা বুঝা গেল মুহূর্তেক পরে তার প্রশ্নটা শুনে: “তারপর কী হলো? কতক্ষণ ছিল সে?” কিন্তু তার বান্ধবী কান্নায় কমা দিয়ে জবাবের বাক্য শুরু করতে যত দেরি করছিল, ততই সে অধৈর্য হয়ে উঠছিল। “কোনো মতে বিদায় দিয়েছিলি, না?” কান্না-ছেড়া কণ্ঠের জবাব এল, “না, প্রায় আধা ঘন্টা বেশিও হতে পারে।”

“ও মাই গড! তাহলে তো সব শুনা দরকার। আমি আসি তোর বাসায়?”

“তাই ভালো হবে।”

“এখখুনি আসছি।”

তার পর খটাখট দুইটা রিসিভার রাখার শব্দ। পাছে রিভাও রিসিভার রেখে দেয় সেই ভয়ে নিজের নিঃশ্বাস গোছ-গাছ ক’রে নিয়ে বললাম, “হ্যালো।”

কোনো সাড়া নেই।

"হ্যালো!"

তবুও কোনো সাড়া নেই।

"হ্যালো রিভা।"

"কে বলছেন?"

"বল তো কে?"

"ও, রাজন? তুমি কখন থেকে লাইনে আছ?"

"কেন, রিং করার পর থেকে।"

ওপাশে দুম ক'রে রিসিভার রেখে দেয়া হলো। এতক্ষণে আমার হুঁশ ফিরল।

২

তারপর রিভাকে ফোন করেছি আরো তিন বার। সে ধ'রেছে। তবে আমি তাকে ধরতে পারিনি। বিকালটা খুব খারাপ কেটেছে। সারারাত ঘুমাতে পারিনি। সকালে আগে-ভাগে এসে ভার্সিটিতে উপস্থিত হয়েছি। রিভার দেখাও পেয়েছি। আকুল হয়ে উঠেছি তার সাথে একান্ত গোপনে কথা বলার জন্য, যা আমাদের উভয়েরই বিগত এক বছরের অভ্যাস। কিন্তু রিভা বদলে গেছে। হঠাৎ ক'রে তার পায়াভারী হয়ে উঠেছে। এখন তাকে আমি ছুঁতে পারি, ধরতে পারি না। আগে আমি তাকে না ছুঁলে সে আমাকে ধ'রে ছাড়ত।

আসলে গতদিন সন্ধ্যায় আমাদের ভার্সিটি ক্যাম্পাসে দেখা হওয়ার কথা ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই তাকে টেলিফোন করেছিলাম। ফোন করারও কথা ছিল। উভয়েরই মৌন সম্মতি ছিল। ঐ সন্ধ্যায়ই দু'জনে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হব। পরিস্থিতি যতদূর সুযোগ দেয়। কিন্তু সব কিছু লণ্ড ভণ্ড ক'রে দিল ঐ ক্রস-কানেকশান।

ভাবতে শুরু করলাম, তাহলে কি রিভার আত্মসম্মানবোধে লেগেছে? কিন্তু তার সাথে তো টেলি-সমাচার কম হয়নি। মাঝে মধ্যে তো টেলিফোনে পুরা রাত

কাবার ক'রে না দিলে কারো মনই ভালো থাকে না। অথচ ও কেন লজ্জা পাবে এই ঘটনায়?

কিন্তু রিভার ব্যাপারে আমি তেমন ভাবিত নই। যা আমার মনে সবচেয়ে বেশি রহস্যের জাল বুনেছে তা হলো সেই ক্রস-কানেকশানের দুই নায়িকার বাক্যতত্ত্ব। তাদের বাক্যতত্ত্ব নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমি প্রথমে তাদের, পরে রিভার, এবং পরে নারীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে একটা বড় মায়াজালের মধ্যে প'ড়ে গেলাম। পণ করলাম, অনেক প্রস্তুতি নিয়েছি। এখন আমি প্রস্তুত। নারী মনস্তত্ত্ব আমাকে জানতেই হবে।

৩

তাহলে এবার ব্যাপারটাকে আরেকটু খোলাসা করি। বয়সের তারুণ্য প্রাপ্তির পর থেকেই আমি একটা প্রশ্ন নিজেকে বারবার করতাম: নারী এত সুন্দর হয় কেন? আমার চিন্তা-ভাবনা, উদ্দেশ্য, স্বপ্ন, বাসনা, আরাধনা সবকিছুর একটা নারী-মুখী গতি কেন? আমি স্কুলে যাই লেখাপড়া শেখার জন্য। বাবা বলেন বড় ইঞ্জিনিয়ার হব। কিন্তু আমি যেই নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কল্পনা করি, অমনি সেই ভাবী-ইঞ্জিনিয়ারের পাশে একটা সুন্দর রমণীর ঝাপসা ছবি কেন ভেসে ওঠে? ছোটবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি আমার একটা গাঢ় অনুরাগ ছিল। তা যত না ধর্মের জন্য, তার চেয়ে বেশি ছিল আরাধনার জন্য। নামাজ প'ড়ে মজাই পেতাম। আর প্রকৃত তৃপ্তিটুকু পেতাম তখন যখন মোনাজাত করতাম। কিন্তু যখনই আমি মোনাজাতের মধ্যে "হে আল্লাহ্, তুমি আমার মনের প্রধান আশাগুলো পূর্ণ করো" বলতাম, তখন বুকের মধ্যে সেই আশাটা আকস্মিকভাবে একটা সুন্দর নারীর ছবিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতো কেন? কেন আমি আজীবন সুখ এবং ইচ্ছে-পূরণ ব'লে যা বুঝেছি, তার প্রধান ভূমিকায় রয়েছে নারীচিত্র? আর দশ জনে স্বাভাবিকভাবে নারীকে কামনা করতে করতে এগিয়ে চলে, অথচ নারীকে কেন কামনা করতে হচ্ছে এই প্রশ্নই আমার চিন্তাকে আরো ঝাপসা ক'রে দেয়। কেন?

ক্রমে ক্রমে বয়স বাড়তে লাগল। আমার কল্পনা এখন আরো নিখুঁত ছবি আঁকতে শিখেছে। আরো বেশি অবাক হচ্ছি আমি। তখন আমি ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষের ছাত্র। বাবাকে বোকার মতো প্রশ্ন ক'রে বসলাম, "আব্বা, মেয়েরাই কি আশরাফুল মাখলুকাত?" শুনে তিনি যে নিঃগর্ভ একটা হাসি দিলেন, তাতে আমার চিন্তার জটলা আরো পেকে গেল। ভাবলাম, তাহলে কি আমার বাবার মনে এসব প্রশ্ন

এখন আর জাগে না? কোনো দিন কি জেগেছিল? কিংবা তিনি কি সব প্রশ্নের জবাব জেনে গেছেন? জ্ঞান তার সব তৃষ্ণাকে মেরে ফেলেছে? নাকি অভিজ্ঞতা তাঁকে ভোঁতা ক'রে দিয়েছে? অথচ সংসারে বাবা-মায়ের সম্পর্ক দেখেছি খুবই ভালো। তবে, এখন মনে হয়, সে সম্পর্ক ছিল স্বামী-স্ত্রীর, পুরুষ-নারীর নয়।

ধীরে ধীরে আমার বিস্ময়ের সাথে তৃষ্ণা এবং তীক্ষ্ণধার ক্ষুধা যুক্ত হতে লাগল। তৃষ্ণা থেকে উদ্ভূত প্রশ্নগুলো আরো বেপরোয়া রূপ ধারণ করতে লাগল। শুরু হলো বিশ্লেষণের পালা। বিস্ময়ের পালা। অভিজ্ঞতা থেকে যে-সব জবাব মাঝে-মধ্যে পেয়েছি, তা আমি কখনও চাইনি। সবচেয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি তখন যখন দেখেছি যে সেই "আশরাফুল মাখলুকাত" নিজেই নিজেকে আশরাফ মনে করে না—অন্তত আমি যে-অর্থে শব্দটাকে ব্যবহার করতে চেয়েছি। লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন পরিচিত সংসারে পুরুষের অনীহজা আর নারীর ভোঁতামি। কেউ কেউ স্বামীর ঘর করছে, অথচ পুরুষ তার যেন তেমন দরকার নেই। কেউ কেউ নিজের রূপ-যৌবনে কোনো আগ্রহ দেখাবার মতো যথেষ্ট তৃষ্ণার্ত নয়, বাড়ি-গাড়িতেই তাদের যত আগ্রহ। নিজেকে পেয়ে কারো কোনো বিস্ময়বোধ নেই। কিন্তু এমন এক নেতিয়ে-পড়া মহিলাকেও যেন আমার কাছে মনে হতো স্বর্গের অপ্সরা।

চিন্তার অক্ষমতাকে হারিয়ে দিয়ে বিস্ময় টিকে থাকতে চায়। এবং বিস্ময় কিছুকাল টিকে থাকতে পারলে তা কোনো না কোনো আধ্যাত্মিকতার জন্ম দেয়। এতক্ষণে নারী আমার মনের অন্য পর্যায়ে ঢুকে গেছে।

কিন্তু তাকে আমি কোনো দিন পাইনি। অনেক মেয়েই আমাকে আকর্ষণ করতে চায়, অথচ কেউ আমার প্রতি আকৃষ্ট হতে চায় না। অন্য কথায়, আমি কাউকে আকর্ষণ করতে পারিনি। আমার এই অক্ষমতা আমাকে তার সম্বন্ধে আরো বেশি প্রশ্নাতুর ক'রে তুলেছে: তাহলে কি আমার মতো এক জাতীয় মত্ততায় নারীও মত্ত নয়?

এক পর্যায়ে এই বিস্ময়ই এক জাতীয় আনন্দের উৎস হয়ে গেল। সেই আনন্দের প্রকাশ ঘটে এক জাতীয় তৃষ্ণা এবং কাতরতার মধ্য দিয়ে।

কিন্তু ঐ যে বললাম—কাতরতা। তা আমার সঙ্গী হয়ে গেল। যেহেতু নারীকে আমি এক জাতীয় আরধনার বিষয় হিসেবে মনে ক'রে এসেছি, সেহেতু তার সাথে আমি সব সময়ে নিজের অজান্তেই কিছু নৈতিকতার ধারণাও মিলিয়ে নেই। আমার

চিন্তায় নারীর সবচেয়ে প্রধান দায়িত্ব হলো আমি যেন তাকে আজীবন সুন্দর বলতে পারি সে ব্যাপারে তার নিজের প্রতি দায়িত্ববতী হওয়া। কিন্তু সুন্দর কাকে বলে? কোন কারণে নারীর সৌন্দর্য-ভঙ্গ হয়? এসব প্রশ্নের কোনো জবাব আমি জানতে পারিনি। শুধু এটুকু বুঝতে পারি যে মাঝে-মধ্যে তাকে সুন্দর বলতে আমার খুব কষ্ট হয়, এবং বলতে না পারার কারণেই দুঃখ পাই আরো বেশি। যাহোক, এই রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে।

ফলে বাবার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য ক'রে ভাবলাম মনোবিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করব। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যের কথা শুনে আমার এক সিনিয়র আত্মীয় আমাকে বলেছিলেন, "উদ্দেশ্য যখন এটাই, তখন তোমার উচিত সাহিত্যের ছাত্র হওয়া।"

আমি জবাব দিয়েছিলাম, "কিন্তু সাহিত্য আমার বিস্ময়কে আরো বাড়িয়ে দেবে। আমি চাই জবাব, প্রশ্ন নয়। নিজেকে আরো বেশি প্রশ্ন করতে হলে আমি পাগল হয়ে যাব।"

তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন, "দ্যাখ, রাজন, তোমাকে যা পাগল করছে তা হলো নারীর সৌন্দর্য। অথচ তোমাকে যা ভাবিয়ে তুলছে তা হলো তার সৌন্দর্য এবং মনের মধ্যে অসঙ্গতি—অন্তত তোমার মতে। তুমি যদি আনন্দ পেতে চাও, তাহলে সৌন্দর্য নিয়ে প'ড়ে থাক। মনটা বাদ দাও। সাহিত্যের ছাত্র হয়ে যাও।"

তার কথাগুলো আমার কাছে খুব নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। যাকে আমি অনুভূতির পর্যায় থেকে ভাবনার পর্যায়ে নিয়ে এসেছি, তা থেকে আমি আনন্দ কিভাবে পাব যদি না ভাবনার ধাঁধাঁর সমাধান পেয়ে তাকে আবারও অনুভূতির পর্যায়ে পাঠাতে পারি।

কিন্তু এখন দেখছি মনোবিজ্ঞানেও কাজ হবে না। মনকে বিজ্ঞানের গবেষণাগারে এনে কাঁটা-ছেড়া করলে পাওয়া যায় নিজেরই ব্যবহৃত কিছু যন্ত্রাংশ। কিছু যান্ত্রিক পরিভাষা। কিছু গাণিতিক বিশ্লেষণ। কিছু আচরণ। কিছু ইতিহাস। তা দিয়ে চমৎকার গবেষণাপত্র তৈরি করা চলে, কিন্তু মনের গভীর গোপন অলি-গলির বিচিত্র রহস্যাবলী জানা সম্ভব হয় না। তাছাড়া নারীর মনের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে তাই পাওয়া যায় যা নারী নিজেই তার সম্বন্ধে ব'লে থাকে। আমার ধারণা, *নারী নিজেই ভালোভাবে জানে না সে নিজের সম্বন্ধে কতটুকু জানে।*

যাহোক, উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পেয়ে গেলাম। নাম বিরূপাক্ষ সরকার। এলিফ্যান্ট রোডে বাসা। তিনি একজন অপেশাদার সাইকিয়াট্রিস্ট। পেশায় প্রফেসর, ঢাকার একটা নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের, তবে মনোবিজ্ঞানের নয়, পদার্থ বিজ্ঞানের। তাও স্বেচ্ছায় চাকুরিচ্যুত। ব্যাপারটা আমার কাছ সত্যিই বিস্ময়কর মনে হলো। নেশা নারীর মন নিয়ে চিন্তা করা। আয়ের উৎস এলিফ্যান্ট রোডের একটা নিজস্ব জুতার দোকান এবং পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতের কিছু বাছা বাছা টিউশনি। সাইকিয়াট্রির কনসালট্যান্সিও করেন, তবে পয়সা নেন না। কেবল ভালো ভালো বই উপহার নেন, তাও উপদেশে কাজ হ'লে। কারো জন্য কখনও কোনো ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন না। তার ভাষায়, "আমি ডাক্তার নই। সুতরাং ওষুধ লেখার যোগ্যতা এবং অধিকার কোনোটাই আমার নেই। তবে আমি পড়া পানি দেই।" কথাটা শুনে একেবারে গাল খুলে হেসেই ফেলেছিলাম। তিনিও। আরও বিস্মিত হলাম তখন যখন জানলাম যে তিন মুসলমান। "তাহলে এই নাম কেন?" জানতে চাইলে তিনি জানালেন যে ওটার তার বন্ধুদের দেয়া নাম। তাঁদের মতে তাঁর নাকি চোখের দোষ আছে। মানুষে চোখের কোণার দিকে তাকান বেশি। এবং তা থেকেই ব'লে দিতে পারেন কার মনের কোন কোণায় কী আছে। "তাহলে আসল নামটা?" বলা যাবে না। যেহেতু এখন এই নামেই সবাই আমাকে চেনে।" আমার উদ্দেশ্যের কথা শুনে তিনি পুলকিত হলেন। বললেন, "পদার্থ বিজ্ঞান আর গণিত শেখার জন্যই আমার কাছে সবাই আসে। কারণ আমার নাম বহুকাল থেকে ঐ জাতীয় নেমপ্লেটে লেখা হয়ে আসছে। আজ আমি একজন খাঁটি ছাত্র পেলাম। আমিই তোমাকে উল্টো পয়সা দেব।" শুনে আরেকবার হেসে ফেললাম। কিন্তু সে হাসি সহসা থেমে গেল। কোনো কথার তীব্র অর্থ শ্রোতাকে হাসতে বারণ করে, কথাটা যতই হাস্যকর হোক না কেন। চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় দেখে বুদ্ধিমানর কম হাসেন। তিনি শুধু আমাকে আপ্যায়নই করলেন না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন ঠিক পরের দিন বিকাল চারটায়, তার নিজস্ব বাসভবনে। আমি চ'লে আসার সময়ে তিনি আমার হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিলেন; রিক্সায় ব'সে পড়ে দেখি তাতে লেখা আছে, "আমাকে বিরূদা ব'লে ডাকবে। আমর মনে রেখ, নারীর মাতৃত্বই নারীকে ধ্বংস করে।"

চা-পর্ব শেষ হলো বিরূদা ঠোঁটে একটা সিগারেট রোপন ক'রে তাতে অগ্নি-সংযোগের জন্য লাইটার জ্বালালেন। অন্যমনস্ক হয়ে বিশাল গোঁফের জটার মধ্য দিয়ে ফোঁস ফোঁস ক'রে নিঃশাস ছাড়তে ছাড়তে এক পর্যায়ে লাইটারের আগুনটা নিভিয়ে দিলেন। সিগারেটটা রেখে দিলেন টেবিলের ওপর। ঠোঁট দুটোকে থেতলে যাওয়া বাংলা পাঁচের মতো ক'রে চোখ দুটোকে কৌণিকভাবে ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে লেকচার শুরু করলেন, "বুঝলে রাজন, নারী হলো একটা আত্মবিরোধ, যাকে বলে কন্ট্রাডিকশন।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না," তাঁর প্রথম বাক্যেই তাঁকে থামিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।

"শুনেই সবকিছু বুঝা যায় না। এখন অনেক কথা শুনে রাখতে হবে যা পরে বুঝবে। প্রত্যেকটা নারী হলো একটা আত্মবিরোধ। অথচ নারী তা বুঝতে পারে না, পুরুষ তা দেখতে পারে না, অথচ তার ধাঁধাঁয় প'ড়ে ঘুরপাক খায়"।

'কিন্তু, বিরূদা, আত্মবিরোধ মানে তো নিজের সাথেই নিজের বিরোধিতা। তাহলে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন নারী একই সাথে নারী এবং নারী নয়?

"হ্যাঁ। মজার ব্যাপার হলো এই যে সে জানে না যে সে নারী, এবং সে ভাবতে চায় না যে সে নারী নয়।"

"সে কেমন কথা?"

"শোনো। নারী যখন নিজের কাছে নিজে ধাঁধাঁয় পরিণত হয় এবং সেই ধাঁধাঁর সমাধান নিজের মধ্যে পায় না, তখন সে মা হবার সিদ্ধান্ত নেয়। সে মাতৃত্বের মধ্যে নারীত্বের পরিপূর্ণতাকে খোঁজে। কিন্তু একটা অকাট্য সত্য কথা মনে রাখবে—মাতৃত্ব কখনও নারীত্বের পরিপূর্ণতা নয়, ধাত্রীবিদ্যা বা সেবিকাবিজ্ঞান বা সামাজিক প্রথা এ ব্যাপারে যাই বলুক না কেন।"

" এ আপনি কী বলছেন!"

“যা সত্য তাই বলছি। দ্যাখ, প্রত্যেকটা নারী একই সাথে কারো মা এবং কারো স্ত্রী বা বন্ধু—যদি স্ত্রী শব্দটাতে তোমার কোনো আপত্তি থাকে। কিন্তু প্রত্যেক নারীই মা হিসেবে সার্থক—কেননা মা হবার জন্য কোনো বিশেষ সাধনার দরকার হয় না। পথে-ঘাটে প’ড়ে থাকলেই মা হওয়া যায়। আধুনিক যুগের পুরুষেরা এত সৎ নয় যে কোনো নারী পথের পাশে প’ড়ে থাকলে তারা তাকে মা বানিয়ে দেবে না। *নারীর জন্য মা হওয়া হলো তার জীবনের, বিশেষত দেহের এবং মনের, স্বাভাবিক বিবর্তনের অন্তর্ভূক্ত একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তার জন্য বিশেষ কোনো মানবীয় সচেতনতার দরকার হয় না। অথচ একজন ভালো স্ত্রী বা বন্ধু হতে পারে ক’জনে? খুব কম সংখ্যক নারী। কারণ তা হতে গেলে সাধনা এবং সচেতনতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হয়। মা হিসেবে সবাই সার্থক, কারণ মাতৃত্বের সার্থকতার দায়িত্ব সন্তানের, মায়ের নয়। এমন কোনো সন্তান নেই যে তার মাকে ভালোবাসে না। অথচ সেই সার্থক মা-ই একই সময়ে অন্য কারো বন্ধু হিসেবে পুরোপুরি সার্থক বা পরিপূর্ণ নয়। হতে পারে সে অক্ষমতার দোষ তার নিজের নয়, কিন্তু বাস্তবতাটা তো তাই। সুতরাং প্রত্যেকটা নারী একই সাথে সার্থক এবং ব্যর্থ। সে একই সময়ে এবং একই সাথে আছে এবং নেই, বড় এবং ছোট, গুরুত্বপূর্ণ এবং তুচ্ছ, মধুর এবং তিক্ত। সন্তানের চোখে তার যে-রূপ, তার প্রধান অস্তিত্ব সন্তানের চোখের মধ্যে; অথচ স্বামীর বা সহধর্মীর চোখে তার যে-রূপ, তার জন্য সে নিজেও দায়ী, কম হোক বা বেশি। সন্তান মকে মায়ের মতো দেখতে পায় ব’লে চিরকাল বাবাকে ভুল বোঝে, অথচ বাবা সন্তানকে সন্তানের মতো দ্যাখে ব’লে তাদের ভুল বুঝার অবিচারের জগদ্দল পাথর বুকের ওপর নিয়ে নিরবে কষ্ট পেতে থাকে। সন্তানের চিন্তাতেই আসে না মা কখনও স্ত্রী হতে পারে, অথচ স্বামীকে মেনে নিতে হয় যে স্ত্রীকেই মা হতে হয়, এবং স্ত্রী মাতৃত্বের ফাঁদে আটকে গিয়ে নারীত্বের মূল্যটাকে পুরোপুরি মাতৃত্বের পেয়ালায় ঢেলে দিয়ে নিজেকে উজাড় ক’রে নিয়ে ব’সে থাকে। ফলে স্বামী তার প্রশ্নের জবাব পায় না, স্ত্রী তার মাতৃত্বের জবাব পেয়ে নিজেকে আর নারীত্বের প্রশ্নটা করে না, সন্তানেরা মায়ের পায়ের নিচে বেহেস্ত পেয়ে তৃপ্ত থাকে। এক বিশাল শূন্যতা এবং ভুলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে একটা সংসার, সমাজ, চেতানা, যুগের ধারা। তার মধ্যে অধিকাংশ দ্বিপদ প্রাণীই মৃত।*”

বিরূদা একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে তাকে ছেড়া-ভাঙ্গা ক’রে আবার বাইরে ঠেলে দিলেন। এবার তিনি সিগেরেটটা জ্বালিয়ে দুয়েকবার অন্যমনস্কভাবে বাতাসের ধোঁয়ার

রিং বানিয়ে ছেড়ে মুখটাকে কিছুক্ষণ বাংলা ও-কারের মতো ক'রে রাখলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন:

নারী জানে না এবং জানার সুযোগও পায় না যে সে নারী। নারীকে মা হতে হয় সংসারের প্রয়োজনে, জীবনের প্রয়োজনে; কিন্তু নারীকে নারী হতে হয় জীবনবোধের প্রয়োজনে, মানবিকতার প্রয়োজনে। জন্তু-জানোয়াররাও মা হয়, কিন্তু তারা নারী হতে পারে না। আবার পুরুষ বিপুল আগ্রহে জানতে চায় নারী আসলে কী। তার ভুলটা হয় এখানে যে সে তা প্রথমে জানতে চায় নারীর কাছেই। সে নারীর কাছে জানতে চায় নারীর রহস্য। সে প্রশ্ন করে—কথায়, আচরণে, ইঙ্গিতে, বিশ্বাসে। তার প্রশ্নের উৎস তৃষ্ণা। নারী সে প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়, সে প্রশ্নের অর্থও সে বুঝতে পারে না, কারন তার জবাব তার জানা নেই। কেবল সেই প্রশ্নই মানুষের কাছে অর্থপূর্ণভাবে বোধগম্য যে-প্রশ্নের উত্তর সে জানে। কিন্তু নারী নারী না হতে পারলেও সে জানে যে সে মানুষ। ফলে সে জবাব একটা তৈরি করে, যা পেয়ে পুরুষ তার প্রশ্নকে পাল্টে ফেলতে বাধ্য হয়। সে হয়ে পড়ে নারী-নির্যাতনকারী, ন হয় নারী বিদ্বেষী, কিংবা 'পুরুষতান্ত্রিক' স্বামী। *নারীর অক্ষমতা এবং অসম্পূর্ণতাই পুরুষকে সংসারের মধ্যে কেবল স্বামী বানিয়ে রাখে।* এই অসম্পূর্ণতা নারীর নারীত্বের অসম্পূর্ণতা।"

"কিন্তু কথাগুলো কি এক তরফা হয়ে যাচ্ছে না?" তাঁকে থামিয়ে দিয়ে কিছুটা অনুযোগের সুরে বললাম আমি।

"হ্যাঁ, যাচ্ছে, কারণ আম একা কথাগুলো বলছি এবং তুমি একা তা শুনছ। এক বাক্যে—এবং এমনকি এক মুখেও—নারী-রহস্য বলে শেষ করা যাবে না। ধাপে ধাপে এগুতে হবে। তবে মানসিকভাবে তোমাকে প্রস্তুত করার জন্য কিছু কথা তোমাকে আগে থেকে শুনিয়ে রাখছি।"

তিনি ব'লে চললেন, "নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমস্যা বহুমাত্রিক। তবে তার মৌলিক পর্যায়ে রয়েছে নারীর নারীত্বের ধারণাটা। আর এই ধারণার কথা যখন ওঠে, তখন প্রথমে একবাক্যে ব'লে নিতে হয় যে নারী হলো একটা ধাঁধাঁ। যাকে বলে প্যারাডক্স, যা আমি আগেই বলেছি। *নারীর দেহ নারীর মতো হলেও তার মনটা নারীর মতো নয়।* নারীর দেহ হলো সৃষ্টির রহস্য। সৃষ্টির রহস্যই সৃষ্টির ধাঁধাঁ। কিন্তু নারীর দেহতে আমরা লৌকিকত্ব আরোপ ক'রে তাকে আমরা ব্যবহারোপযোগী পণ্যের মতো

গ্রহণ ক'রে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি এবং ধাঁধাঁর বৈশিষ্ট আরোপ করি তার মনের ওপর। অথচ নারীর দেহ কেবল পুরুষের জন্য 'আল্লাহ্‌র নিয়ামত' নয়, তা রীতিমতো একটা অলৌকিক ব্যাপার। নারী নিজেই তা জানে না। এ কারণে সে তার দেহ আর মনের মধ্যে স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপন করতে পারে না। পুরুষও একই ভুল করেঃ সে নারীর দেহ থেকে আহৃত প্রশ্নের জবাব খোঁজে নারীর মনের রাজ্যে। মানুষের প্রশ্ন যেখানে থাকে, তার উত্তর সেখানে থাকে না। মানুষ—অন্তত বুদ্ধিমান মানুষ— প্রশ্ন আহরণ করে যে-বাস্তবতা থেকে, জবাব সে-বাস্তবতায় খোঁজে না। এটাই উচিত। তবে পুরুষ বড় ভুলটা করে এখানে যে, সে প্রশ্ন করে উত্তরের জায়গায় এবং উত্তর চায় প্রশ্নের জায়গা থেকে। তার করা উচিত উল্টোটা—তার প্রশ্ন করা উচিত নারীর মন সম্বন্ধে এবং জবাব খোঁজা উচিত তার দেহের মধ্যে। সব লৌকিকের সর্বশেষ রহস্য লুকিয়ে আছে অলৌকিকের মধ্যে। *নারীর মন হলো তার দেহ সম্বন্ধে তার ভুল ধারণা।* সে ধারণা সে নিজের ভুলের ফলশ্রুতি হিসেবে নিজের মধ্যে তৈরি করে, এবং একই সাথে পুরুষ এবং সমাজ-ব্যবস্থার কিছু ভ্রান্তিও তার সেই ভ্রান্ত ধারণায় বিভিন্নভাবে ইন্ধন যোগায়। নারীর মন তার নারীত্বপূর্ণ দেহ সম্বন্ধে তার নারীত্বহীন আত্ম-বিবেচনার শিকার।"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে নারীর দেহরহস্য না জেনে তার মনোরহস্য জানা সম্ভব নয়?"

"না। নারীর দেহরহস্য পুরুষ যতটা জানে, নারী ততটা জানে না। কারণ নারীর কাছে তার দেহটা কোনো রহস্যময় কিছু নয়। তা রহস্যময় কেবল পুরুষের কাছে। আসল ব্যাপার হলো, নারী যতদিন না জানছে যে তার দেহই সৃষ্টির সবচেয়ে বড় রহস্য এবং সেই অনুসারে সে তার মনটাকে ব্রহ্মাণ্ডের মতো বিশালতা দান না করছে, ততোদিন সে নিজেকে কোনো প্রশ্নই করতে শিখছে না, পুরুষের প্রশ্নের জবাব দেয়া তো দূরের কথা।

আমরা পুরুষের যখন নারীর মনের রহস্যের কথা বলি, তখন আসলে তার দেহের সাথের মনের অমিলের কথাই বলি। তার মনটাকে আমরা তার দেহের মতোই বিশাল এবং দুর্বোধ্য অথচ মধুর ভাবতে চাই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা যখন আশা-ভঙ্গের দুঃখ পাই, তখন ব'লে বসি যে নারীর কোনো নির্দিষ্ট মন নেই। নারীর দৃষ্টিতেও ব্যাপারটা ঠিক এরকমই জটিল—সে পুরুষের বিস্ময় দেখে বিস্মিত হয়ে যায় এবং

রীতিমতো ঘাবড়ে যায়; ভাবে, 'পুরুষের অত তৃষ্ণা এবং অনুসন্ধিৎসা মেটাবার সাধ্য আমার তো নেই। সে আমার কাছে কী চায়?' ফলে নারী হয়ে ওঠে কৌশলপ্রবণ। সে পুরুষের মন জয় করার জন্য কৃত্রিম কৌশলের আশ্রয় নেয়। ফল হয় উল্টো। পুরুষ নারীকে নারী হিসেবে ভাবার মধুর ধৈর্যটা আর ধ'রে রাখতে পারে না। সুন্দর যখন কৌশলের আশ্রয় নেয়, তখন তার সৌন্দর্য নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। তখন এক নারীকে বাহুর মধ্যে রেখেও পুরুষ স্বপ্ন দ্যাখে অন্য এক নারীর—কল্পনার নারী, যাকে সে পায় না, শুধু পেতে চায়, অথচ জানে যে তাকে কোনো দিনও পাওয়া যাবে না, আর পাওয়া যাবে না বলেই তাকে এত বেশি ভালোবাসে—'সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে/নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।' তার আসা কোনোদিন শেষ হয় না। পুরুষ চায় ও না সে একদিন আসুক। কেননা এলে সে তার কৃত্রিমতার মুখোশ পরেই আসবে। তখন পুরুষ হা-হুতাশ করবে, 'যখন এলে তখনও এলে না।' তাকে আবারও পাঠাকে কল্পনায়। লিখবে কবিতা, আঁকবে ছবি। পুরুষের কষ্টই তাকে কবিতা লেখায়, ছবি আঁকায়—প্রেম নয়। একটা চমৎকার জিনিস হয়তো লক্ষ্য করছ: *শিল্পী তাঁর প্রিয়তমার ছবি আঁকার পর প্রিয়তমার চেয়ে ছবিটাকে বেশি ভালোবাসেন। কারণ কী?* কারণ পুরুষ নারীকে পূর্ণাঙ্গভাবে ভালোবাসতে চায়। বেছে-খুঁটে ক্ষমা ক'রে ভালোবেসে তার পোষায় না। অথচ নারী চায় ভালোবাসা আদায় ক'রে নিতে। পুরুষ চায় স্বাভাবিকভাবে উজোড় ক'রে দিতে। নারী যদি তার ভালোবাসাকে অধিকারের পর্যায়ে নিয়ে তাকে আইনী চরিত্র দেয়, তাহলে পুরুষ সিংহের মতো গর্জে ওঠে। অবশ্য এসব ব্যাপার অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এসব কিছুকে ধীরে ধীরে বুঝার প্রয়োজন আছে।"

"তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে নারীকে নারী হতে হবে পুরুষের দিকে তাকিয়ে?"

"আসলে *নারী যদি তার দেহের দিকে তাকিয়ে তার মনটাকে সমন্বিত ক'রে নেয়, তাহলে নিজেকে সঠিকভাবে রূপদান করতে তার আর অন্যের দিকে তাকাবার প্রয়োজন হয় না। তখন সে নিজেই বুঝতে পারে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে তাকে অন্য কারো ভাষার আশ্রয় নিতে হবে কি না।"*

"তাহলে পুরুষের বেলায় কী বলবেন? পুরুষকে কি নিজেকে মাপতে হবে নারীর মাপকাঠি দিয়ে?"

“না। এমনকি পুরুষকে তার দেহের দিকে তাকিয়েও মনকে কোনো বিশেষ আকৃতি দেয়ার দরকার নেই। পুরুষকে আগে তাকাতে হবে তার মনের দিকে—তার দায়িত্ব, তার নৈতিকতা, তার মূল্যবোধ এ সবকিছুকে তার আগে গঠন ক’রে নিতে হবে। এই অর্থে *পুরুষ হওয়া বড় কঠিন। তাতে সাধনার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু তবুও সে সাধনাতে প্রায়ই কোনো আত্মবিরোধ নেই। পুরুষের সাধনা বহুমুখী ব’লে তা কঠিন, অথচ তাতে আত্মবিরোধ নেই ব’লে তা তাকে বিভ্রান্ত ক’রে না। সে বিফল হলেও সফলতার অর্থ তার কাছে পাল্টে যায় না। অথচ নারী বিফল হলে সে সফলতার দায়িত্ব চাপায় অপরের ঘাড়ে—অন্য কোনো পুরুষের বা নারীর ঘাড়ে—কিংবা সফলতার সংজ্ঞা পাল্টে দেয়ার চেষ্টা করে।*

এখানে মূল বিষয়টাকে বুঝতে হবে: *পুরুষ যখন নারীর রূপে পাগল হয়, তখন উক্ত রূপের ধারণার মধ্যে তার মনটাকেও অন্তর্ভূক্ত ক’রে নেয়। ফলে নারীর কাছে তার যাকিছু চাওয়ার থাকে, তখন সে তা চায় শুধু তার রূপের এবং দেহের কাছে নয়, মনের কাছেও। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে সে যখন মিল খুঁজে পায় না, তখন সে আহত হয়।* আবার পুরুষ হলো শিশুর মতো। আহত কেন হতে হলো এই আক্ষেপ তাকে আরো বেশি আহত করে। তখন পুরুষ-নারীর স্বাভাবিক মধুর সম্পর্ক নষ্ট হতে থাকে। ঐ যে বলেছি না, পুরুষ শিশুর মতো। এই সত্যটাকে পুরুষ নিজেই অনেক সময়ে বুঝতে পারে না। কিন্তু আসলে সে তাই। কখনো কখনো কোনো ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কারণে শিশু যদি মা-বাবার বা বড়দের কোনো সাময়িক কষ্টের কারণ হয়, এবং বড়দের কাছ থেকে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদ আসে, তাহলে শিশুর মনে এক জাতীয় আক্ষেপের সৃষ্টি হয়, এবং সে ভাবে, ‘তোমাকে বুঝে না বুঝে একটু কষ্ট দিয়েছি ব’লেই তুমি তার প্রতিশোধ নিলে? একটু নিরবে সহ্য করলে কী হতো? আমাকে একটু প্রশ্রয় দিলে কী হতো? তাতে আমি যেমন নিজের মনের আগুনে নিজেকে শুধরে নিতে পারতাম, তেমনি তোমার প্রতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ থাকতে পারতাম।’ কিন্তু শিশুর এই আবদার পূরণ হয় না ব’লে সে মনের কষ্টে আরো বেশি শিশু-সুলভ আচরণ করতে থাকে। পুরুষের ব্যাপারটাও ঠিক এরকমের। সে নিজে ছোট খাট ভুল-ত্রুটি কখনো কখনো ক’রে ফেললেও সে তার জন্য নারীর কাছে নিরব প্রশ্রয় এবং সহাস্য ক্ষমা চায়। সে চায় নারী তাকে কৃতজ্ঞ ক’রে রাখুক। কারণ তার চিন্তায় নারী অত্যন্ত বড়। তার ভুল-ত্রুটি শোষণ ক’রে নেয়ার মতো স্বাভাবিক ক্ষমতা

নারীর আছে ব'লে সে ধ'রে নেয়। নারীর সম্বন্ধে তার এই পূর্বধারণাই তাকে শিশুর মতো অবোধ ক'রে দেয়।

লক্ষ্য কর, রাজন, যে-পুরুষ তার মাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসছে, সে-ই আবার একই ঘরের মধ্যে তার স্ত্রীকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করছে। কারণ কী? জন্মদাত্রীর প্রতি মানুষের সহজাত কৃতজ্ঞতা? সেই কৃতজ্ঞতার উপাদান মানুষ সহ যে-কোনো পশুর চরিত্রেও আছে। কিন্তু ওটা পুরুষের মাতৃভক্তির উৎস হলেও মাতৃ-ভালোবাসার উৎস নয়। *মায়ের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা আসলে অকৃত্রিম নয়, তা কৃত্রিম*—অর্থাৎ এক সময়ে তা ছিল পরিস্থিতি-নির্ভর, এবং এখন তা তার মনের অকৃত্রিমতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মাতৃ-প্রেমের আসল উৎস হলো প্রশ্রয়। সন্তান সবচেয়ে বেশি প্রশ্রয় এবং ক্ষমা পায় মায়ের কাছ থেকে। সে ক্ষমা নিঃশর্ত ক্ষমা। মায়ের বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি অপরাধের কৈফিয়ত-বিহীন ক্ষমা। এই ক্ষমা তার মনে এক জাতীয় কৃতজ্ঞতা জাগিয়ে তোলে। জগতের আর কেউ সেই কৃতজ্ঞতার ভাগীদার হতে পারে না ব'লে সে মাকে হৃদয়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা আসনে বসায়। কেন, একটা জিনিস লক্ষ্য করনি? —সচরাচর মেয়েরা বড় হয়ে যখন কষ্টে প'ড়ে অতীতের কথা স্মরণ করে, তখন তারা প্রথমে স্মরণ করে দাদী বা নানীর কথা। আমাদের সমাজে মায়ের কাছে ছেলেরা যতটা নিঃশর্ত প্রশ্রয় এবং আদর পায়, মেয়েরা তত পায় না। তারা সেই প্রশ্রয় পায় দাদী ও নানীর কাছে। এর সঙ্গত কারণ আছে। এর দোষ সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতার নয়, মাতৃত্ব-বিকৃতির। *মায়েরা সচরাচর 'পুরুষের' মা হতে চায়—কেউ কেউ 'সুপুরুষের'।* ফলে একই সাথে বেড়ে উঠতে থাকা ছেলে এবং মেয়ের দিকে তারা ভিন্ন দৃষ্টিতে অজ্ঞতাপূর্ণ প্রথাচালিত ভঙ্গিতে তাকায়। অবশ্য এ ব্যাপারে এখন ব্যাপক আলোকপাত করতে চাই না। শুধু এটুকু ব'লে রাখি, *এই সমাজে নারীর নারী হবার পথে বাঁধা হয়ে ব'সে আছে নারীর বিকৃত নারীত্ব এবং মাতৃত্ব। মা যখন মেয়েকে ছেলে থেকে আলাদাভাবে দ্যাখে, তখন মেয়ের মধ্যে তীলে তীলে নারীত্বের বিশালতার মৃত্যু হতে থাকে।* তাতে ইন্ধন যোগায় বাবার তথা পুরুষজাতির নিষেধাজ্ঞা। মা ঘটায় মেয়ের নারীত্বের মৃত্যু, আর সমাজ তার পায়ে শেকল পরায়। প্রথম এবং মৌলিক ভুলটা করে মা। সমাজ যে–ভুলটা করে তাকে শোধরানো সম্ভব। তবে প্রথম ভুলটা না শুধরে দ্বিতীয়টাকে শোধরালে নারী তখন পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে গিয়ে সমাজটাকে রসাতলের দিকে ঠেলে দেয়।

আবারও বলি, *মাতৃত্ব কোনো বিখ্যাত গুণ নয়। তা এক জাতীয় জৈবিক দক্ষতার এবং তৃষ্ণার ফলশ্রুতি। তার সাথে নারীত্বের সফলতার কোনো সম্পর্ক নেই—কোনো সম্পর্ক নেই। যে নারী মা হয়, সে কেবল তার নিজের সন্তানের মা হয়। মাতৃত্ব যদি এতই মহৎ কোনো গুণ হতো, তাহলে মাতৃত্ব অর্জন করর পর কোনো নারী কেবল নিজের সন্তানেরই মা হয়ে সংকীর্ণতার ফাঁদে আটকা প'ড়ে থাকত না, পৃথিবীর যাবতীয় সন্তানের দিকেও সে মাতৃত্বের মহৎ চশমার মধ্য দিয়ে তাকাত।* কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয় ঠিক তার উল্টোটা। মা হবার আগে নারী যে-কোনো শিশুকে কিছু-না-কিছু পরিমাণে মাতৃত্বের দরদে ভালোবাসে, অথচ মা হবার পর তার মনটা আরো ছোট হয়ে যায়। তখন এমনকি ননদের বা ভাসুরের বা দেবরের সন্তানকেও সে বেশি ভালোবাসতে পারে না। মাতৃত্বই তার নারীত্বকে ছোট ক'রে দেয়। ফলে পুরুষ-সমাজ এমন মাকে কল্পনা করে যিনি হবেন বিশ্বমাতা। সৃষ্টি হয় বিশ্বমাতা, দেশমাতা, মা কালী, মা দুর্গা, মা স্বরস্বতী ইত্যাদি শব্দের এবং প্রতীকের। মানুষ যখন তার অস্তিত্বের মধ্যে অস্তিত্বের যাবতীয় ব্যাখ্যা এবং তৃপ্তি পায় না, তখন সে উদ্ভাবন করে এমন কিছু প্রতীকের যার ব্যাপ্তি দেশ-কাল-পাত্র ছাড়িয়ে অস্তিত্বকে উপচে দিয়ে অনস্তিত্বেও অস্তিত্ববান থাকবে ব'লে সে মনে করে। নারীকে পুরুষ এত বেশি ভালোবাসে এবং এত বেশি বড় ক'রে দেখতে চায় যে তার ওপর সে দেবিত্ব আরোপ করতেও দ্বিধা করে না। মাতৃত্ব যেমন নারীকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এনে বেঁধে রাখে, তেমনি নারীর প্রতি পুরুষের এই তীব্র ভালোবাসাই তাকে কখনো কখনো সংকীর্ণ ক'রে দেয়। ফলে সে নারীকে শুধু তার *নিজস্ব* সঙ্গী হিসেবে পেতে চায়। পুরুষ সমাজ যত লোলুপ হতে থাকে, তত অন্যান্য পুরুষের হস্তক্ষেপের ভয়ে তার এই সঙ্গীটিকে সে 'বস্তু' হিসেবে ভাবতে শেখে এবং এভাবে তাকে শুধু শয্যাসঙ্গীনি হিসেবে ধ'রে রাখতে চায়। *মানুষ তার প্রিয় বস্তুটাকে সবচেয়ে গোপন জায়গাটাতেই লুকিয়ে রাখতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক।* এই বোধ যখন নির্বুদ্ধিতার এবং আবেগের একাগ্রতার সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়, তখন পুরুষ সতীদাহ প্রথার মতো মানব ইতিহাসের জঘন্যতম যজ্ঞ চালু করে। নারীর প্রতি পুরুষের অন্ধ ভালোবাসাই সতীদাহ প্রথার প্রবর্তন করেছিল, যদিও তথাকথিত মার্ক্সবাদীরা এবং বিদ্যোৎসাহী গবেষক সমাজ তাকে সম্পত্তি রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যাখ্যা করে। মনে রাখা দরকার যে, *কোনো প্রথার শুরু হবার ইতিহাস যা, তার টিকে থাকার ইতিহাস তা না-ও হতে পারে।* এই ঘৃণ্য প্রথাকে টিকিয়ে রেখেছিল মানুষের অর্থ-লোলুপতা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার উৎস ছিল মানব মনের সম্পূর্ণ বিপরীত একটা মেরুতে। নারীকে যখন স্বামীর সাথে

সহমরণেই যেতে হবে, তখন বাবার সম্পত্তিতে তার আর ভাগ পাওয়ার দরকারটা কী? তখন তা তো বেহাত হয়ে যাবে। আবার বাবার কাছে মেয়ের যদি দাবী না থাকে, তাহলে স্বামীর কাছে তা কোনোক্রমেই থাকতে পারে না। *আমরা বাবারা আমাদের মেয়েদেরকে বঞ্চিত করে ব'লেই তাদের স্বামীরা তাদেরকে ঠকায়।* কারণ উপযুক্ত অযুহাত তারা দেখাতে পারছে। যাহোক, এভাবে সম্পত্তি টিকিয়ে রাখতে হলে প্রথাটাকেও টিকিয়ে রাখতে হবে। সুতরাং, রাজন, মনে রাখবে শরৎচন্দ্রের সেই কথাটা, 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, তাহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়'। অবশ্য আমি বলতে চাই, বড় প্রেম ক্রমে ক্রমে ছোট হতে চায়। প্রেম না জেনে প্রেম করতে গেলে মানুষ এরূপ কাণ্ডই ঘটায়।"

"কিন্তু বিরূদা," আমি বললাম, "পুরুষ যেমন শিশুর মতো আচরণ করতে চায়, নারীও কি তা চায় না? আমার তো মনে হয় উক্ত মনোভাব নারীর মধ্যেই বেশি।"

"ঠিক। কিন্তু সমস্যাটা সেখানে নয়। পুরুষ হলো নারীর বিশাল আশ্রয়। পুরুষ তাকে সে আশ্রয় স্বাভাবিকভাবেই দেয়। তা বুঝা যায় নারী পুরুষ যখন দৈহিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয় তখন। তখন নারী স্বাভাবিকভাবে যা চায় পুরুষও স্বাভাবিকভাবে তাকে তা দিতে চায়। এ ব্যাপারটা ছোটবেলার বন্ধু-বান্ধবদের বা ভাই-বোনের মধ্যে গা টিপে দেয়ার পারস্পারিক লেনদেন নয় যে, প্রথমবার যেজন দিবে পরে তাকে আবার তার প্রতিদান দিতে হবে—তাতে দেয়ার বিপরীতে প্রতিদান থাকবেই, নইলে ঝগড়া লেগে যাবে; এ হলো একই সাথে দেয়া এবং নেয়া—নারী দেয়, পুরুষ তা পায়, এবং পুরুষের পাওয়াই তার তরফ থেকে নারীকে উপযুক্ত প্রতিদান দেয়া। প্রকৃতির এই সমীকরণে কোনো ভুল নেই। অথচ পুরুষ সমকামীদের মধ্যে এরূপ স্বাভাবিক সমীকরণ নেই। সেক্ষেত্রে একটা বিশেষ মুহূর্তে এক জন দেয় এবং অন্যজন তা শুধু পায়; ভারসাম্যের জন্য তাদেরকে আবারও একই প্রক্রিয়াকে উল্টোমুখী করতে হয়। পুরুষের এই ব্যবহারিক দৈহিক আদলটা নারীর সাথে তার মানসিক আচরণের ক্ষেত্রেও বজায় থাকতে চায় এবং তা থাকেও। কিন্তু পুরুষের আকাঙ্খার বিশালতাই তাকে দুঃখ দেয়—সে আচরণগত কিছু ব্যাপারে স্ত্রীর কাছ থেকেও সেই জাতীয় কিছু প্রশ্রয় পাওয়ার আশা করে যা সে পেত তার মায়ের কাছ

থেকে। যখন সে ব্যর্থ হয়, তখন সে সমাজের তথাকথিত প্রথম লিঙ্গধারী পুরুষের মতো আচরণ করতে প্রবৃত্ত হয়।

এখন তাহলে দোষ কার—নারীর মাতৃত্বের নাকি পুরুষের শিশু সুলভ আকাঙ্খার, যা সে তার মায়ের মাতৃত্বের অনুষঙ্গে নিজের মধ্যে স্থায়ীভাবে গঠন ক'রে নিয়েছে এবং নিজের স্ত্রীর নারীত্বের ওপরও যার কিছু দিককে সে উপরিপাতন করতে চায়? আমি বলব দোষটা মাতৃত্বের। নারী যখন মা হয়, তখন সে তা হয় অযৌক্তিকভাবে। নিজের সন্তানের সব দোষ সে অন্ধের মতো ক্ষমা করে। সে এতটা উদার হয় যে সে উদারতা যুক্তিকে হার মানায়। পুরুষ নিজের অজান্তে তার স্ত্রীর কাছেও এরূপ উদারতা কামনা করে। আসলে এ উদারতা মনস্তাত্ত্বি নয় কিংবা যৌক্তিকও নয়, তা হলো স্রেফ জৈবিক। যদি তাকে মনস্তাত্ত্বিক বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে তা জৈবিক মনস্তত্ত্ব। আমি ব্যক্তিগতভাবে এরূপ মাতৃত্বকে মহান বলি না। এর নামই যদি হয় মাতৃত্ব, তাহলে জগতের সবচেয়ে আদর্শ মা পাওয়া যাবে কিছু কিছু প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে, মানুষের মধ্যে নয়। আর যদি এরূপ মাতৃত্বকে মহানই বলতে হয়, তাহলে একটা কথার জবাব দাও তো: যে হৃদয়ের এই বাঁধ-ভাঙ্গা অসীম মাতৃত্বকে ধারণ করার ক্ষমতা আছে, তার মধ্যে অন্য একজন পুরুষকে ক্ষমা-সুন্দর প্রশ্রয় দেয়ার বন্ধুসুলভ উদার মানসিকতাটা কেন নেই? তাহলে কি মাতৃত্ব কেবল একটা জৈবিক ব্যাপার নয়? তাহলে কি তা পারিবারিক এবং সামাজিক এবং মানবীয় অর্থে ব্যর্থ নয়? ব্যক্তিগতভাবে আমি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি, তখন থেকে আমার মায়ের কাছে এমন কোনো মাতৃত্ব আশা করিনি যার বিশালতার আবশ্যকতা একই হৃদয়ের অন্য একটা গুণের সংকীর্ণতাকে আবশ্যক ক'রে তুলবে। অবশ্য এজন্য আমার মা আমাকে একটু খারাপ চোখে দেখতেন। *মায়েরা যখন তাদের মাতৃত্বের ঝাল পুরোপুরি ঝাড়তে না পারে, তখন তাদের কাছে সন্তান কোনো উপযুক্ত সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয় না।* অথচ জৈবিক বন্ধন তাদেরকে মা বানিয়ে রাখতে চায়। ফলে তারা সন্তানকে ক্ষমা ক'রেও অসংখ্য অশ্রুর পাহাড়-প্রমাণ কষ্ট বুকে ধারণ ক'রে নিরবে ক্ষয়ে যেতে থাকে। মাতৃত্ব মানেই সংকীর্ণতা। অবশ্য কথাটা ভাবতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়।"

একটু থেমে নিজের ঝাপসা কষ্ট এবং চিন্তাকে গোছ-গাছ ক'রে নিয়ে তিনি ব'লে চললেন, "এতক্ষণ আমি যা বলেছি তা ছিল নারীর মনের বিভিন্ন দিককে বিশ্লেষণ করার এবং আবিষ্কার করার কিছু প্রাথমিক রেফারেন্স পয়েন্ট। এগুলো হলো

নারী-মনের জটিলতার কিছু মৌলিক উৎস, তবে সে জটিলতার প্রকাশ বিচিত্র এবং কখনো কখনো প্রচণ্ডভাবে বিভ্রান্তিকর। নারীর গোপন ইচ্ছা—কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরকীয়াত্ব, অর্থ গৃধ্নুতা, হিংসা, উচ্চাকাঙ্খা, দাম্ভিকতা ইত্যাদি আপাত-বিচ্ছিন্ন ঘঁনা আরো রহস্যময়। তবে এই সব বিষয়ের মধ্যে কিছু মৌলিক যোগসূত্র আছে যা জানা শুধু পরমানন্দের নয়, রীতিমতো দিগ্বিজয়ের মতো গর্বের বিষয়।"

"ধামি সব জানতে চাই," তাকে থামিয়ে দিয়ে এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেললাম আমি।

"আগামী কাল বিকাল চারটায় এস। তার মধ্যে আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু কাজ সেরে ফেলতে পারব।"

ঈরদিন যথাসময়ে বিরূদার বাড়িতে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি ইশারায় আমাকে বসতে বললেন। তিনি কিছু কাগজ ঘাটাঘাটি করছিলেন। কাগজপত্র ঘাটাঘাটির সময়ে চশমার মধ্য দিয়ে তাঁর তাকানোর ভঙ্গি দেখলে অনুমান করা যায় যে তাঁর বয়স আসলে পঞ্চাশের উপরে। অন্য সময়ে তা বুঝা যায় না। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দেবার সময়ে একটা দরকারি কাগজের দিকে তাকাতে তাকাতে তিনি বললেন, "ভেবেছিলাম তুমি আসার আগে কাজগুলো সেরে ফেলতে পারব। কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারলাম না।"

আমি তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, "আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি আপনার কাজ সারুন, তারপর আলাপ হবে। আমার অন্য কোনো তাড়া নেই।"

"তাহলে ততক্ষণে চা খাও। আমি আর সামান্য একটু কাজ সারতে পারলে ফ্রি হয়ে যাব।"

আমার জন্য চা এল। আমি যতক্ষণ চা খাচ্ছি, ততক্ষণ তিনি কয়েকটি ফাইলের মধ্যে ঘাটাঘাটি ক'রে কী যেন একটা দরকারী কাগজ খুঁজছিলেন। তার কাজের ধরন দেখে বুঝতে পারছি যে তিনি কিছু লিখিত কেস হিস্ট্রি কোনো একটা নির্দিষ্ট ধারায় সাজাচ্ছেন। কিন্তু কালেকশানটার প্রথম কেসটা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁকে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছে। হঠাৎ একটা কাগজ হাতে পেয়ে তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "পেয়েছি"।

তার আনন্দ সংক্রামক ব্যাধির মতো আমারও চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

"হ্যাঁ, তাহলে এবার আমাদের আলোচনা শুরু করা যায়। আজ তোমাকে নারীর মনের রহস্যময় সাগরের দ্বিমুখী স্রোতে ভাসাব।"

"দ্বিমুখী স্রোত?" বিস্ময়বোধক প্রশ্ন করলাম আমি।

"হ্যাঁ। সে সাগরের তিনটা স্রোত। স্রোত বয় দুদিকে।"

"সে আবার কেমন? স্তর তিনটা, অথচ স্রোত বয় দুদিকে।"

“নারীর মনকে যদি সাগরের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে বলা যায় যে সাগরটার পানি তিনটা ভাগে বিভক্ত। উপরের স্তরের একপাশের পানির স্রোত এক দিকে, এবং অন্য পাশের পানির স্রোত ঠিক বিপরীত দিকে।”

“আর নিচের স্তরের?”

“নিচের স্তরের পানিতে কোনো স্রোত নেই।”

“চমৎকার তো। কিন্তু আরেকটু স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলে ভালো হতো।”

“নারীর মনের সচেতন স্তরের দুই ধারার গতি-প্রকৃতি দুই রকমের। একটা হলো মাতৃত্বের ধারা এবং অন্যটা হলো নারীত্বের ধারা। আগের দিন আমরা সে ব্যাপারে কিছুটা আলোকটাত করেছি। কিন্তু নারীর মনের আরেকটা স্তর আছে—যা সব মানুষেরই আছে—তা হলো অবচেতন স্তর। কিন্তু আমি ঠিক এই স্তরের এক অংশের কথা বলতে চাচ্ছি, যাকে আমি ব'লে থাকি *মগ্নচেতন স্তর।*”

“তা কেমন?”

“তা আসলে স্বাভাবিক অবচেতন নয়, তা উৎস সচেতন স্তরে, কিংবা অবচেতন স্তর থেকে তা উঠে এসে মাঝে মাঝে সচেতন হয়। কিন্তু নারী ইচ্ছে করেই তাকে চেপে রাখে বা রাখতে চায়। এবং সে স্পষ্টভাবে জানেও যে সে তা চেপে রাখছে। এই চেপে রাখার দায়িত্ব তাকে প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট দেয়। কিন্তু সব কষ্টেরই একটা সীমা আছে। তা তাকে কষ্ট দেয় ব'লে পরবর্তীতে তা থেকে সে উক্ত কষ্টের প্রতিদানটুকু উসুল ক'রে নিতে চায়।”

“কিভাবে?”

“তাকে ইচ্ছে ক'রে অবচেতন স্তরে পাঠিয়ে দিয়ে। তাতে তার লাভ হয় এই যে সেখানে সে সময়মতো এবং সুবিধামতো চুপিসারে ডুবসাঁতার খেলতে খেলতে পারে। জগতের কেউ তা জানতে পারে না।”

“রহস্যজনক মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি না আপনি কিসের কথা বলছেন।”

“পরকীয়া ইচ্ছা!”

“মাই গড! সব নারীর মধ্যেই এটা আছে?”

“এক বাক্যে জবাবটা দেয়া সম্ভব নয়। তবুও আপাতত বলব যে আছে। তবে এই পরকীয়াত্ব দোষের পর্যায়ে না-ও যেতে পারে। তাছাড়া আমরা এখন দেখব সেই রহস্যের কিছু খণ্ডচিত্র। তার ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দিব কিছু দিন পর।”

“কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে এই গোপনচারিতা থেকে কি নারীকে আলোর পথে আনা যায় না?”

“প্রশ্নটা বড় অসময়ে ক'রে ফেলেছ। এর জবাবও চ'লে আসবে নারী-রহস্যের ব্যাখ্যার সাথে। তাছাড়া তুমি যাকে ‘আলো’ বলছ মনের জন্য তা মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। *আমরা আমাদের সামাজিক ধর্মীয় পারিবারিক নৈতিকতার আলোয় নারীর হৃদয়ের গলি-ঘুঁজি সব আলোকিত ক'রে তাকে পুরোপুরি পবিত্র ক'রে নিতে চাই ব'লে সে বেঁচে থাকার তাগিদে নিজের জন্য হৃদয়ের মধ্যে গোপন গুহা তৈরি করে এবং এভাবে সে তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য হলেও লুকিয়ে লুকিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। হৃদয় নিয়ে বেঁচে থাকা একটা অতি-ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাতে অতি-প্রিয়জনেরও হস্তক্ষেপ চলে না। সেখানে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে নারী হয় মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বে না হয় তার প্রকাশ দিকটাকে গোপন ক'রে গোপন দিকটাকে প্রখর আলোয় এনে প্রদর্শন করবে।”*

“এ কি রহস্য! তাহলে নারী মানেই কি মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত মানুষ?”

“বললাম তো, হুট ক'রে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ো না। মানব হৃদয়ের গোপন অলি-গলি তো থাকবেই। তা না হলে হৃদয়ের কোনো মানে হয় না। এই গোপনতাই নিজস্ব আনন্দের উৎস। আবার ধ্বংস যখন আসে, তখন এখান থেকেই তা উঠে আসে। অতএব আপাতত নারীর এই নিভৃতচারিতারকে দোষের পর্যায়ে না নিয়ে একটা কেস-হিস্ট্রি শোনো।”

আমি বিপুল আগ্রহে নিজেকে গুছিয়ে নিলাম। নারীর হৃদয়ের এই দিকটাই আমার কাছে বেশি লোভনীয়। মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ল সেই ক্রস-কানেকশান...। স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারছি আমার সেই আগ্রহের সাথে মিশে আছে এক জাতীয়

কাতরতা, সাসপেন্স, এবং ভয়মিশ্রিত হিমেল অনুভূতি। নারীর মনের গোপনাকে জেনে ফেলতে নারীর ওপর কি কোনো ঘৃণাবোধ জন্মাবে আমার মধ্যে? কিংবা কোনো ভীতি? কিন্তু তবুও জানতে হবে। ছোটবেলায় অন্ধকার ঝোঁপের দিকে তাকিয়ে কাঁপতে থাকতাম। চোখ সরাতে পারতাম না। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই এক পর্যায়ে মাকে ডাকতাম, "মা, ভূত!"

মা দৌঁড়ে আসতেন, "কই, কোথায়?"

"ঐ তো, শুপারি বাগানের ঝোঁপের মধ্যে।"

"কই, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"আমিও ন া।"

"তাহলে তাকিয়ে আছিস কেন?"

"না দেখে তো ঘুমাতে পারব না, মা। ভয় বেড়ে যাবে।"

মা হাতের চেটো দিয়ে পিঠের ওপর দুটো টোকা দিয়ে কাপালে একটা চুমু দিয়ে বলতেন, "কী আমার মর্দ্দ! ভূত দেখেও ভয় পাবে না ব'লে মনে করে, আবার না দেখলে ভয়ে পাথর হয়ে যাবে।" তারপর তিনি জানালাটা বন্ধ ক'রে আমাকে উল্টোমুখী ক'রে শুইয়ে দিয়ে রান্নাঘরে চ'লে যেতেন বাকি কাজগুলো সারার জন্য।

মাঝে মাঝে অবশ্য অবস্থা এমন পর্যায়ে যেত যে ঝোপের মধ্যে কিছু না দেখতে পারলে মনের সন্দেহটা ঘুচতো না। অবস্থাটা মা বুঝতে পারতেন। তখন একটা হারিকেন জ্বালিয়ে আমাকে নিয়ে যেতেন ঝোপের কাছে। হারিকেনের আলোয় ঝোঁপ-ঝাড়ের মধ্যে মধ্যে লুকানো অন্ধকারকে ধুয়ে-মুছে ভালো ক'রে দেখিয়ে দিতেন। মনের সন্দেহ ঘুচত।

কিন্তু তখন বুঝতে পারতাম না যে সন্দেহের উৎস মন, অন্ধকার নয়। অথচ সে সন্দেহ ঘুচানোর দায়িত্ব মনের নয়, অন্ধকারের। অন্ধকারকে দোষ না দিতে পারলে, কিংবা তাকে নির্দোষ প্রমাণ না করতে পারলে, মনে স্বস্থি আসে না। এই তাৎপর্য এখন বুঝতে পারছি বিরূদার কথা শুনে। এবং ঝোঁপের অন্ধকারের নিরীহতার ঘটনা হারিকেনের আলোয় দেখিয়ে দেয়ার পর আমার মনে একটা নোতুন সন্দেহের

সৃষ্টি হলো—তখন হারিকেনের আলোকে আমি সন্দেহ করতে শুরু করলাম। একদিন বললাম, "মা, তোমার ঐ হারিকেনের আলোতে কি অন্ধকারের সব লুকানো জিনিস দেখা যাচ্ছে?"

মা আমার দিকে সন্দেহপূর্ণ ভীরু এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন।

"ভূত তো তোমার আলোর মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে। পারে না মা?"

মা কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তারপর আমার সাহস বাড়ানোর জন্য উল্টো পন্থা অবলম্বন করলেন: একই সাথে বকা-ঝকা এবং ঝাড়-ফুক চলল কিছু দিন।

কিন্তু তখন আমার ভয় পাবারই সময়। সুতরাং অন্ধকার এবং আলো দুটোকেই সন্দেহ করা আমার জন্য স্বাভাবিক ছিল। মা তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই একদিন তিনি জানালাটাকে খোলা রেখে আমাকে খাটের ওপর শুইয়ে দিয়ে রান্নাঘরের সমাপনী কাজগুলো করতে গেলেন। এদিকে ঝোঁপের অন্ধকার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু আজ যেন অন্ধকারের চেহারা আরো বিদঘুটে মনে হচ্ছে। এখন আমি অন্ধকারকে শুধু দেখতে পাচ্ছি না, শুনতেও পাচ্ছি! কী একটা খসখসে শব্দ হচ্ছে তার মধ্যে। অন্ধকারও যেন ন'ড়ে-চ'ড়ে রূপ বদলাচ্ছে। অন্ধকার যখন ন'ড়ে ওঠে, তখন তার গুমোট ঘুটঘুটে ঠান্ডা ভাবটা আরো বেড়ে গিয়ে তা থমথমে হয়ে ওঠে। গা ঘেমে উঠতে লাগল। আমার চিৎকার ক'রে উঠলাম, "মা!মা!"

মা ছুটে এলেন। "কী হয়েছে বাবা?"

"ভূত! সেই ভূত!"

"কই, দেখাতো আমাকে।"

"ঐ যে, ঐ দ্যাখ নড়ছে।"

"কী নড়ছে?"

"অন্ধকার।"

"অন্ধকার নড়ছে? তা কী ক'রে হয়?"

“হ্যাঁ, মা, ভূত নড়লেই অন্ধকার ন’ড়ে ওঠে।”

আমার চোখ এখনও সেই অন্ধকারের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মায়ের সাথে কথা বলছি। ভেবেছিলাম মা হেসে ফেলবেন। কিন্তু শুনা গেল তাঁর গলার গম্ভীর এবং ঔৎসুক্যপূর্ণ স্বর, “তাহলে আমাকে দেখা তো, বাবা?”

“ঐ যে, তাকিয়ে দ্যাখ।”

“কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি না।”

“কিন্তু আমিও যে তোমাকে দেখাতে পারছিন না, মা, শুধু দেখতে পাচ্ছি।”

“তাহলে চল কাছে গিয়ে দেখে আসি।”

“না, মা, তোমার হারিকেনের আলোয় ওসব দেখা যাবে না।”

“যেতেও পারে। নড়ছে যখন, তখন দেখা যাবে না কেন?”

“চল তাহলে।”

মা আমাকে নিয়ে হারিকেনটা সামনে উঁচিয়ে ধ’রে খুব সন্তর্পনে ঝোঁপের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। যেন চোর ধরতে যাচ্ছি আমরা। আমরা একটু একটু ক’রে ঝোঁপের দিকে এগুচ্ছি, আর একটু একটু ক’রে অন্ধকার আলোয় পরিণত হচ্ছে। “সত্যি সত্যিই তো ঝোঁপ-ঝাড় কাঁপছে।”—বিস্ময়োক্তি করলেন মা। আমি শিউরে উঠলাম। “ভয় পাসনে, বাবা! আজ আমরা ভূতটাকে ধরবই।”

কাছে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার সারা গায়ে ঝাড়া দিয়ে স্নায়বিক ভূতটা ধস ক’রে মন থেকে খ’সে প’ড়ে গেল। লজ্জা-মিশ্রিত একটা দুর্বোধ্য শব্দে হালকামিপূর্ণভাবে ককিয়ে উঠলাম। হল-গলিয়ে বিপুল অন্ধকারের মধ্যে ঝনঝনি বাজিয়ে মা খকিয়ে উঠলেন, “ও, হালে তুমিই সেই ভূত? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।” তিনি পাশের গাছ থেকে ছোট একটা ডাল ভেঙ্গে আমাদের বাছুর সুমিকে তাড়া করলেন। সে ওখানে মনের আনন্দে ঘাস খাচ্ছিল।

সারারাত চমৎকার ঘুম হলো। হয়তো স্বপ্নও দেখিনি।

সকালে গিয়ে দেখি ঝোঁপের মধ্যে ছোট্ট একটা খালি জায়গায় কয়েকটা কাটা ঘাস বিছানো। বুঝতে পারলাম, মায়ের চাতুরি। ভূতকে সত্যি সত্যি তাড়িয়ে দেবার জন্য তিনি আগে ভূতকে বানিয়ে নিয়েছেন। বাছুরটাকে ওখানে রাখার জন্য তাকে সামান্য কিছু তাজা ঘাস দেয়া হয়েছিল, যা আমাদের বাড়ির কাজের লোকটা প্রত্যেক দিন বিল থেকে কেটে আনত।

কিন্তু কৌশলেও কাজ হয়, যদি তা উপযুক্ত কৌশল হয়। ফলে কয়েক মাস শোবার সময় তেমন ভয় পাইনি। তবুও কিছুকাল পর আগের মানসিক অবস্থাটা আবার ফিরে আসতে লাগল। এবার নিজেই দুয়েকটা উদ্যোগ নিলাম ভয় তাড়াবার জন্য। কিন্তু ভয় তাড়াবার প্রচেষ্টাই ভয়কে ডেকে আনে। সুতরাং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই যা ছিলাম তাই হয়ে গেলাম। অবস্থার অবনতি দেখে মা বললেন, "তাহলে কি বাছুরটাকে প্রত্যে রাতে ওখানে বেঁধে রাখব?"

"না, মা, তোমার বাছুরকেও আমার সন্দেহ হয়।"

"তাহলে আমাকে এখন কী করতে বলিস? অত বড় ধাড়ি ছেলের অত ভয় থাকবে কেন?"

"ঝোঁপটা কেটে বাগানটাকে পরিষ্কার ক'রে ফ্যাল।"

তাই করা হলো।

আমি রাতের বেলায় সাহসী হয়ে গেলাম।

কিন্তু রাতের ভয় উঠে এল দিনের আলোয়। তখন ভর দুপুরে এবাড়ি ওবাড়ি বিলে-ঝিলে বিভিন্ন ঝোঁপের কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম—যদি সত্যি সত্যি ভূত দেখা যায়। না দেখে তৃপ্তি নেই যে।

না দেখলে বুঝব কিভাবে তাকে আমার কতটুকু ভয় পাওয়া উচিত। যৌবন-প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত সেই ভয় আমার ছিল। কিন্তু আমি ভূতকে কখনও পাইনি। কারণ রাতের ভূতকে আমি খুঁজেছি দিনের আলোয়।

হয়তো বিরূদার কাছে নারীর ব্যাপারে সব জানা হয়ে গেলে আমার একই অবস্থা হবে। তবুও তা আমাকে জানতে হবে। নারীর চিন্তা আমার সমগ্র সত্তায় একাকার হয়ে মিশে আছে যে।

"এই দ্যাখ, রাজন, একটা চমৎকার কেস হিস্ট্রি। তিন দিন আগে জানতে পেরেছি।"

বিরূদার কথায় সম্বিৎ ফিলে এল আমার। "তাহলে কি এটা দিয়েই শুরু করবেন?"

"হ্যাঁ"।

"তথাস্তু। তবে বিষয়টা কী নিয়ে?"

"একজন ব্যতিক্রমধর্মী ধর্ষণকারীর আত্মকথা।"

"ব্যতিক্রমধর্মী ধর্ষণকারী? ওরা তো সবাই একই ধাঁচের।"

"কিন্তু এ লোকটা অন্য ধাঁচের। শোনো তাহলে। লোকটার নাম বলব না। তিনি আমার একজন পুরনো এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উচ্চশিক্ষিত। বড় ব্যবসা করেন। টাকার অভাব নেই। অথচ আমার জানা মতে, প্রায় চারিত্রিক কলংক ব'লে যা বুঝায় তা তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি। এই ধরনের ঘটনা তাঁর জীবনে এই প্রথম। তবে ঘটনাটা ঘটেছিল এখন থেকে এক যুগ আগে। এবং এখনও ঘটছে। "

"এখনও ঘটছে মানে?"

"মানে এখনও ঘটছে।"

"অর্থাৎ সে একবার ধর্ষণের পথে পা বাড়িয়ে এখন আর স্বাভাবিক জীবন-যাপনে ফিরে যেতে পারছে না? একের পর এক চালিয়ে যেতে হচ্ছে?"

“না। উনি এখন একই নারীর সাথে একই কাজ বারবার চালিয়ে যাচ্ছেন।”

“তাহলে তো তা ধর্ষণ হলো না।”

“প্রথমে যা ঘটেছিল তাকে ধর্ষণ বলা যায়। অন্তত তিনি তাই বলতে চান। আর পরে এখন যা ঘটছে তাকে তিনি বলছেন জেনা, অর্থাৎ অবৈধ যৌনাচার?”

“কিন্তু মেয়েটা তাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে না?”

“তিনি বিবাহিতা”।

“মাই গড! তার স্বামী জানলে?”

“জানে।”

“কী বলছেন এসব! এ যে ধাঁধাঁর মতো লাগছে।”

“কিন্তু লোকটার স্ত্রী জানে না যে তিনি এসব ক’রে বেড়াচ্ছেন।”

“কিন্তু উনি কি মহিলাটাকে বিয়ে করতে চান?”

“ঐ মহিলার সাথেই তার বিয়ে হয়েছিল একুশ বছর আগে।”

“কত আগে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল?”

“ছাড়াছাড়ি হয়নি।”

“তার মানে তাঁর বর্তমান স্ত্রী জানে না যে তিনি গোপনে গোপনে বৈধ কাজ করেছেন। আর এক কারণেই তাঁর এরূপ কার্যকলাপকে অবৈধ বলছেন, এই তো?”

“না। তিনি জীবনে মাত্র একবারই বিয়ে করেছেন। অর্থাৎ তিনি তার স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত।”

“এবার আমার কাছে সবকিছু উল্টোপাল্টা মনে হচ্ছে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“ঘটনাটা রোমাঞ্চকর বটে। তাঁরা একই সংসারে বসাবস করেন এবং স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই। অথচ তারা অভিসারে মিলিত হচ্ছেন অন্য একটা জায়গায়। স্বামী জানেন যে তিনি স্ত্রীর সাথে মিলিত হচ্ছেন, অথচ স্ত্রী মনে করছেন যে তিনি তার প্রেমিকের সাথে গোপন অভিসার করছেন। তাঁদের বয়স নিতান্ত কম নয়, যদিও লোকটা আমার এক জুনিয়র বন্ধু।”

“হায় আল্লাহ। এ তো কখনও শুনিনি। নিশ্চয়ই এক জাতীয় বেগানা আনন্দ পাচ্ছেন ওঁরা।”

“তা ঠিক। তবে অবশেসে সে আনন্দটা অঙ্গারে পরিণত হয়েছে।”

“সে কেমন?”

“তা মুখে ব’লে সংক্ষেপে বুঝানো যাবে না। এই নাও লোকটার নিজের হাতে লেখা ডায়েরি। পড়লে সব জানতে পারবে। তুমি ব’সে ব’সে পড়। ততক্ষণে আমি কিছু দরকারী কাজ সেরে নেই। এর মাঝে অবশ্য একজন রোগীর আসার কথা আছে। এলে ও ঘরটায় গিয়ে তার সাথে আলাপ করতে হবে। চা-কফি-নাস্তা দেয়ার লোক তো আছেই। যখন যা লাগে চেয়ে নিও।”

আমি আর কথা না বাড়িয়ে লোলুপের মতো ডায়েরিটা পড়তে শুরু করলাম। ডায়েরিটাকে দিন-তারিখ উল্লেখ ক’রে ভাগে ভাগে ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়নি। প্রথম থেকে এই পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা ঘটে যাবার পর গোটা গল্পটাকে একটা গোপনীয় আত্মজীবনী হিসেবে লেখা হয়েছে। তাকে একটা গল্পের মতো নাম দেয়া হয়েছে—‘দাগ’। সুতরাং স্টাইলটা ডায়েরি লেখার স্টাইলের চেয়ে বেশি সুখপাঠ্য। প্রথম থেকেই তা গল্পের মতো গড় গড় প’ড়ে ফেলা যায়।

দাগ

১

আমার নাম ধাম পরিচয় এখানে উল্লেখ করব না। কারণ পাঠক-নন্দিত কোনো আত্মজীবনী লেখার জন্য এখন কলম ধরিনি। আমি কোনো লেখকও নই। আমি শুধু বর্ণনা করতে চাচ্ছি আমার জীবনের একটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত গোপন ঘটনাকে। এ

লেখা কোনো পাঠকের জন্য নয়। নিজের জন্য। আমি শুধু একটা রহস্যময় ঘটনার প্রক্রিয়ার মধ্যে একমুখী স্রোতে ভেসে চলেছি। যা ঘটছে কেবল তাকেই অনুভব করতে পারছি। পেছনে ফিরে দেখার মতো বৌদ্ধিক স্থিরতা আমার নেই বললেই চলে। কিন্তু জীবনের প্রবাহের সাথে ভেসে যেতে যেতে জীবনকে শুধু অনুভব করা যায়, অথচ তার শুরু এবং শেষকে হাতের মুঠোয় ক'রে নাড়াচাড়া করতে না পারলে তার যৌক্তিক তাৎপর্যটাকে সার্বিকভাবে বুঝা যায় না। আমার মতে জীবন শুধু অনুভূতির ব্যাপার নয়, তার যৌক্তিক অর্থময়তাকেও গাণিতিক সমীকরণে ফেলে কিছুটা বুঝার প্রয়োজন আছে। হাজার হলেও মানুষ চিন্তাশীল জীব। অনুভূতিতে সে যতই ঐশ্বর্যবান হোক না কেন, চিন্তার মধ্যে তার অস্তিত্বের সত্যটাকে একটা যৌক্তিক রূপ না দিতে পারলে সে পুরোপুরি তৃপ্তি পায় না। এ কারণে যা ঘটেছে এবং ঘটছে তার সার্বিক কাঠামোটাকে নিজের দৃষ্টিগোচর করানোর উদ্দেশ্যেই আমার এই খণ্ডজীবনী লেখার প্রয়াস। লেখাটা আমি ভিন্ন কোনো পাঠকের হাতে প'ড়ে গেলে তাঁকে আমি বিনীত অনুরোধ করব, এটাকে যেন তিনি নিছক একটা গল্প হিসেবে ভাবেন। অপরের জীবনের কিছু কিছু ব্যাপারকে নিশ্চয়ই নিছক গল্পের পর্যায়ে ফেলে বিবেচনা করা উচিত, নয় কি?

আমি আমার জীবনের যে রহস্যজনক ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি তা শুরু হয়েছিল আমার বিয়ের আগে—তবে আমার জীবনে নয়, অন্য একজনের জীবনে। অন্য একজনের জীবনে যা শুরু হয়েছিল, তা এসে শেষ হয়েছিল আমার জীবনে। এজন্যে আমার আমিত্বের মধ্যে আমার নিজের অবদান কতটুকু, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি বুঝতে পারছি না আমার মধ্যে অন্য কেউ ঢুকে পড়েছে, নাকি আমি ঢুকে পড়েছি অন্য কারো মধ্যে। এমনকি এই লেখার মাধ্যমেও আমি নিজের মধ্যে অন্য কাউকে খুঁজছি নাকি অন্য কারো মধ্যে নিজেকে খুঁজছি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। ছাত্র হিসেবে তেমন ভালো আমি কখনও ছিলাম না। কিন্তু ভালো ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ফলে আমার যত ক্লাশফ্রেন্ড ছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল ভালো ছাত্র এবং ঐ ডিপার্টমেন্টে আমার ব্যাচের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিল যে ছেলেটা, সে ছিল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নাম ইরাজুল ইসলাম।

আমি ছিলাম আর্থিকভাবে সচ্ছল—একজন সফল ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলে। ইরাজ এসেছিল গ্রাম থেকে। তার বাবার আর্থিক অবস্থাও তেমন ভালো ছিল না। তবে ছেলেটা যেমন ছিল মেধাবী, তেমনি ছিল মার্জিত, সদালাপী, মিষ্টভাষী এবং অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। ওকে আমার অত্যন্ত ভালো লাগত। ওর সাথে আমার মেলামেশা এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে ওর প্রায় প্রতিরাতের খাবার রান্না হতো আমাদের বাসায়। প্রায়ই ইরাজ রাত এগারটা পর্যন্ত আমাদের বাসায় থাকত। আমরা কখনো গ্রুপ স্টাডি করতাম, কখনো গল্প করতাম। ওর জীবনে একটা প্রেম এসেছিল। তা নিয়ে আমরা অনেক গল্প-গুজব করতাম। তার এই প্রেমের উপাখ্যানই পরবর্তীতে আমার জীবনকে প্রভাবিত করেছিল।

২

ইরাজ ধানমন্ডির একটা অভিজাত বাসায় একটা মেয়েকে পড়াত। ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রী। নাম রূপা। ইরাজের মুখের কথা শুনে জেনেছি, মেয়েটা ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। পড়ানোর মাত্র দুই মাসের মধ্যেই তারা একে অপরের প্রেমে প'ড়ে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে পড়ার টেবিলে পড়া তেমন হতো না। হতো শুধু গাল গল্প আর লিখিত বাক্যের শূন্যস্থান পূরণ। একদিনের ঘটনা বলি। ইরাজ রূপার একটা খাতার একটা পাতায় লিখল:

Fill in the blank:

I love...................

রূপা শূন্যস্থানে লিখল myself। ইরাজ একটু হেসেও ফেলল। খানিকটা কষ্টও পেল। সে আবারও প্রশ্ন দিল:

Because...........

রূপা জবাব দিল:

Because you love me.

ইরাজের কল্পনা আকাশ ছুঁতে চাইল। সে রূপার হাতটা ধ'রে চকিতে একটা চুমু খেল। শুরু হয়ে গেল ভিন্ন মাত্রার সান্নিধ্য।

এর পর থেকে তাদের অভিসার চলত ঘরের বাইরে পার্কে, ভার্সিটি ক্যাম্পাসে, চাইনিজে, এমনকি কিছু কিছু মার্কেটেও। কিন্তু তার জন্য দরকার হতো টাকা। রূপা ইরাজের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা জানত। তাই যাবতীয় খরচ সেই বহন করত। কিন্তু ইরাজের তাতে নিজেকে ছোট মনে হতো। সে চাইত তার ভালোবাসার জন্য নিজের টাকা খরচ করতে। কিন্তু তার নিজের রোজগার সে কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফলে সে ভাবল, নিজের টাকা খরচ করতে না পারলেও এসব ক্ষেত্রে অন্তত নিজের পকেট থেকে খরচ করতে পারা উচিত। সে চাপ পড়ল আমার ওপর। "টাকা ধার দিতে হবে।"

আমার টাকার কোনো সংকট ছিল না। তাছাড়া পড়াশুনার সুবাদে ওকে আমি প্রতি মাসে কিছু টাকা নির্ধারিত হারে দিলেও ওরে প্রতি আমার ঋণ শোধ হয় না, তা আমি জানতাম। অধিকিন্তু, তার মতো ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধুকে টাকা ধারন না দেয়ার মতো সংকীর্ণতা আমার কোনো কালে ছিল না। সুতরাং ওর যাবতীয় আউটডোর খরচের ফান্ড আমাকেই যোগাতে হতো। অবশ্য টাকাগুলোর জন্য সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল।

৩

একদিন রাত প্রায় দশটার সময়ে ইরাজ আমার বাসায় ছুটে এল। তাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। আমার রুমে এসেই ধপ ক'রে সোফার ওপর ব'সে পড়ে নিশ্চুপ হয়ে রইল।

"কী রে ইরাজ, কোন সমস্যা?"

"হ্যাঁ রে দোস।"

"কী সমস্যা তা তো বলবি।"

"রূপার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।" এই ব'লে সে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। গায়ে হাত দিয়ে প্রবোধ দিতে চাইলাম। আর অমনি সে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে শুরু করল।

“সে বিয়েতে রূপার মত আছে?”

“না। সে আমাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে।”

“কিন্তু এই মুহূর্তে তুই বিয়ে ক’রে সংসার সামলাতে পারবি?”

“রূপাও জানে আমি তা পারব না। ”

“তাহলে?”

“ও বলেছে আমার পড়ালেখা শেষ হবার আগ পর্যন্ত সংসারের দায়িত্ব ও নেবে?”

“তুই কি তা চাস?”

ইরাজ কোনো কথা বলল না। কিছুক্ষণ কেঁদে হঠাৎ যেন স্বাভাবিক হয়ে গেল। চোখের পানি মুছে ফেলল। কিছুক্ষণ চুপ ক’রে রইল। তার পর মুখটা কঠোর ক’রে দাঁত কিড়মিড় ক’রে জানালার দিকে তাকিয়ে ওর হাতের মধ্যে রাখা আমার হাতটাকে একটা শক্ত চাপ দিয়ে বলল, “খুন করব!”

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আর ইরজাকে দেখতে পেলাম না।

কিছুক্ষণ দুজনে নিরব রইলাম।

জানতে চাইলাম, “কাকে?”

আরো কিছুক্ষণ ও কী যেন ভাবল। তারপর স্বাভাবিক হয়ে বলল, “সরি, দোস। আবেগের মুহূর্তে ব’লে ফেলেছিলাম।”

“ইরাজ, আমাকে সত্যি ক’রে বল তো রূপা তোকে কী বলেছে।”

ওর চোখে আবারও পানি চ’লে এল। “দোস। রূপাকে ভুল বুঝিস না। আসলে ও আমাকে ভালোবাসে। আমি আর্থিকভাবে অসচ্ছল জেনেও ও আমাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে মেয়েরা যখন ভালোবাসে তখন তারা সংসার পাতানোর চিন্তা করতে চায় না। অন্তত টিন-এজারদের জন্য কথাটা সত্য। অথচ যখন তারা সংসার পাততে চায়, তখন ভালোবাসার ধারণাটাকে নোতুন ক’রে

সংজ্ঞায়িত ক'রে নিতে চায়। টিন-এজারদের মধে এই প্রবণতা কিছুটা কম হলেও অভিভাবকদের প্ররোচনা এবং পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিজেদের তুলনা তাদেরকে ভালোবাসার বৈষয়িক পরিণতির ব্যাপারে ভাবিত ক'রে তোলে। রূপা যদি আমাকে কোনো শর্তমূলক কথা ব'লে থাকে, তাহলে তা বলেছে আমার পৌরুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য। তার কথার জন্য সেও কম কষ্ট পায়নি বা পাচ্ছে না।"

"তার মানে এই যে রূপা তার অভিভাবকদের আয়োজিত বিয়েতে রাজি?"

"না।"

"তাহলে?"

"সে আমাকে কাপুরুষ বলেছে। দুয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে বিয়ে করতে বলেছে। কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তে আমি বলেছি, 'তা সম্ভব নয়। আজ তোমাকে ভালোবেসে দুদিন পর আমি তোমাকে কষ্ট দিতে পারব না।' আমি জানি যে, যে ভালোবাসে এরকম প্রবোধ তার জন্য আরও কষ্টকর। সে-কষ্টও সে পেয়েছিল। তারপর সেও কয়েকদিন সময় নিয়ে সবকিছু নোতুন ক'রে বিবেচনা করল। অবশেষে সে আমাকে দুটো শর্ত দিল।"

"কী শর্ত?"

"তার সাথে বিয়ে না হবার ঘটনাটাকে আমাকে হাসিমুখে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। দুঃখ পাওয়া যাবে না।"

"কঠোর শাস্তি। আরেকটা শর্ত?"

"আজীবন তার কাছাকাছি কোথাও থাকতে হবে, যেন মাঝে-মধ্যে তার সাথে দেখা-সাক্ষাত হয়।"

"রহস্যজনক! তুই কী বললি?"

"জবাব এখনও দেইনি। দুয়েক দিনের মধ্যে দিব।"

"কিন্তু বড়লোকের মেয়ে। এত সাত-তাড়াতাড়ি তাকে বিয়েই বা দিচ্ছে কেন?"

“আমাদের ঘটনা জানাজানি হওয়ার কারণে। এমনকি মহল্লার সবাই জানে।”

“ছেলে ঠিক হয়েছে?”

“যতদূর জানি, হয়নি। তবে প্রস্তুতি চলছে।”

“তুই এখন ওদের বাসায় যাস?”

“না।”

কিছুক্ষণ চুপ ক’রে থেকে ইরাজ অত্যন্ত লজ্জিতভাবে এবং আবেগের সাথে আমাকে বলল, “দোস, কী ক’রে যে বলি, এমনিতেই তোর কাছে অনেক ঋণ ক’রে ফেলেছি.... ।”

“টাকা লাগবে, এই তো?” তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম আমি, “কত?”

“আমার কাছে কিছু আছে। আর কিছু হলে আমি ওকে একটা আংটি উপহার দিতে পারতাম। বিয়ের পর ও আমাকে ভুলে যাবে, তা আমি জানি। তবুও যদি একটা স্মৃতিচিহ্ন রেখে দিতে পারি।” তার চোখ আবারও ভিজে উঠল।

ওর কাছে কত আছে তা আর আমি জানতে চাইলাম না। ওকে তখনই তিন হাজার টাকা দিলাম। ঐ রাতেই সে হলে ফিরে গেল।

৪

তারপর কমপক্ষে দু’সপ্তাহ আমি ইরাজের দেখা পাইনি। হলে গিয়েছি। ওর রুমমেট বলেছে যে সে প্রতিরাতে হলে ফিরে আসে। তবে একদিন ফেরেনি। এদিকে বাসার চাকর-বুয়াদের কাছে শুনেছি কয়েকদিন সে আমার জন্য ব’সে থেকে চ’লে গেছে। সামনে পরীক্ষা থাকায় আমি এ কয় দিন লাইব্রেরি ওয়ার্ক নিয়ে একটু বেশি ব্যস্ত ছিলাম। লাইব্রেরিতেও তাকে পাইনি।

পরীক্ষার দুদিন আছে, এমন সময়ে হঠাৎ ক’রে রাত প্রায় এগারটায় আমার বাসায় ইরাজের অভ্যুদয় ঘটল। তার চোখে-মুখে বিমর্ষ ভাবটা আর নেই। মনে হলো, যুদ্ধযাত্রার পর ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এসেছে।

“কি রে, এতদিন কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিলি?”

“দুদিনের জন্য একটু বাড়ি গিয়েছিলাম। মাকে দেখতে।”

“আর বাকি ক’দিন?”

“এক দিন কাটিয়েছি রূপার সাথে।”

“বেশ তো। আবার সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে নাকি?”

“বিদায় নিয়েছি।”

“হাসিমুখেই?”

“হ্যাঁ।”

“পেরেছিস?”

“পেরেছি, কারণ সে আমার শর্ত না মানলেও আমি আমার চিহ্ন রাখতে পেরেছি।”

“কী শর্ত?”

“একটা রাত আমার সাথে হোটেলে থাকার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। রাজি হয়নি। তবে একটা *দিন* তাকে রাখতে পেরেছিলাম।”

“ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলি?”

“হ্যাঁ। তবে একটা সীমার মধ্যে। তাছাড়া আমার উদ্দেশ্য ছিল দুজনের স্বামী-স্ত্রী পরিচয়টাকে লিখিত রূপ দেয়া, নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়া নয়।”

“লিখিত রূপ দেয়া মানে? বিয়ে?”

“আরে না। হোটেলে সিট বুকিং করাতে হলে পরিচয় লেখাতে হয় না?”

কথাটা শুনে আমার বুকের মধ্যে কোথায় যেন টনটন ক'রে উঠল। ইরাজ তার ভালোবাসাকে কোথায় নিয়ে গেছে! হতে পারে যে এটাই প্লেটোনিক লাভের একটা ব্যবহারিক দিক।

"আর কী চিহ্ন রাখতে পেরেছিস বললি? আংটি দিয়েছিস নাকি?"

"না রে দোস। টাকায় কুলাতে পারিনি। তাছাড়া আংটির চেয়ে স্থায়ী চিহ্ন রাখতে পেরেছি ব'লে আংটির কতা এখন আর ভাবছি না।"

"কী সেটা?"

"দাগ। একটা গাঢ় দাগ।"

"মানে তুই ওকে শারিরীকভাবে কষ্ট দিয়েছিস?"

"হ্যাঁ। নাভীর পাশে জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন ভেঙে ফেলেছিলাম। এমনভাবে যেন ও বুঝতে না পারে আমি স্বেচ্ছায় কাজটা করেছি। খুব কষ্ট পেয়েছিল। একটু চিৎকারও দিয়েছিল। সাথে সাথে পানি দিয়ে ধুয়ে দিয়েছিলাম। চামড়া উঠে সাদা দাগ হয়ে গেছে। কদিনের মধ্যেই হয় সাদা না হয় কালো একটা স্থায়ী দাগ তৈরি হবে।"

"তুই এ কাজ করতে পারলি? আর তা নিয়ে হাসি মুখে কথা বলতে পারছিস?"

"অমর হয়ে রইলাম দোস। যতদিন দাগটা থাকবে, ততদিন আমিও ওর দেহের এবং মনের সাথে মিশে থাকব।"

"আবার কবে দেখা করবি?"

"জানি না। তার তরফ থেকে ইচ্ছে নেই। আর দেখা করবে না ব'লেই সান্নিধ্যটা দিয়েছিল।"

ঐ রাতে ইরাজ আমার কাছেই ছিল। ওকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলেই গিয়েছিলাম বাকি দিনগুলোতে ও কোথায় ছিল, কেন আমার সাথে দেখা করেনি। সবচেবয়ে বিস্মিত হলাম তখন যখন দেখলাম যে ফাইনাল পরীক্ষা সে দিচ্ছে না। হলে খোঁজ নিলাম। সেখানে সে নেই। দুদিন পর একটা চিঠি পেলাম:

আবেগের মাথা তোকে দুটো ভুল কথা বলে ফেলেছিলাম—'খুন করব' এবং 'চিহ্ন রেখে দিয়েছি'। তার দ্বিতীয়টার জন্য তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আসলে চিহ্নের ঘটনাটা সত্য নয়। আমাকে মাফ করিস। তোর কাছে আমি অনেক টাকা ঋণী। সে জন্য ক্ষমা চাই না। কারণ তুই আমার কেমন বন্ধু তা আমি জানি। মায়ের অসুখ। বাবার শরীরও ভালো না। তাই কিছুকাল গ্রামের বাড়িতে থাকতে হবে। পরে দেখা হবে।

তোর জন্য রইল আমার চিরকালের ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা।

ইরাজ

চিঠিটা যখন পাই তখন কেবল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ভাবলাম ওর মা-বাবাকে দেখতে যাব। কিন্তু তখনই হুট ক'রে মা-বাবা দুজনেই প্রস্তাব করলেন, "তোকে বিয়ে দেব। পাত্রী ঠিক হয়েছে।"

প্রস্তাবটা শুনে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তবে আকাশ থেকে পড়িনি। কারণ অন্য কোনো মেয়ের সাথে আমার কোনো অ্যাফেয়ার ছিল না যে বাবা-মায়ের ঠিক করা বিয়ের প্রস্তাবে অযৌক্তিকভাবে তৎক্ষণাৎ 'না' বলতে হবে। কিন্তু তাদের ব্যতিব্যস্ততায় একটু অবাক হয়েছিলাম বটে। মাকে বললাম, "কিন্তু এত তাড়াহুড়ো কেন?"

"মোটেও তাড়াহুড়ো করিনি। আমরা আগে থেকেই মেয়েকে তিনবার দেখেছি। তোকে একটা সারপ্রাইজ দে ব'লে এতদিন তোকে কিছু জানাইনি। সামনে পরীক্ষা ছিল। তাছাড়া তুই আমাদের যে-কোনো রায় মেনে নিবি এ বিশ্বাস আমাদের আছে।"

আর কথা বাড়ালাম না। কারণ কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। হাতে মাত্র দুদিন সময়। ফলে ইরাজকে আনতে যাওয়াও হলো না। এত বড় আনন্দের কাজে এই একটা ব্যথা বড় বেশি বুকে বাজল।

মেয়ের নাম আফসানা জাহান। বাসা গুলশান। বাবার নিজের বাড়ি। দুই ভাইয়ের একমাত্র বোন। ছবি দেখে মনে হলো খুব সুন্দরী।

কিন্তু কে জানত আমার ভাগ্যে এই লেখা ছিল।

বাসর ঘরে স্ত্রীর সাথে পরিচয়ের কিছুক্ষণ পরই পরিচিত হলাম তার নাভীর পাশের একটা দাগের সাথে।

সাদা দাগ। বুকের মধ্যে ককিয়ে উঠল আমার। এই সেই রূপা! সারা দেহের স্নায়ুতন্ত্রে কে যেন এসিড ঢেলে দিল আমার। শরীরটাও কাঁপতে লাগল। নিঃশ্বাসে বিকৃতি আসতে লাগল। সেই অনুভূতি চাপা দিতে বাথরুমে চ'লে গেলাম।

মুহূর্তের ধাক্কাটাকে সামলে নিয়ে জানতে চাইলাম, "রূপা, দাগটা কিসের?"

রূপা তারই নাম। ফলে সে অবাক হয়নি। কিন্তু দাগটার কথা বলতেই সে কিছুটা চমকে উঠল। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই জবাব পেলাম যে ওটা মাছ ভাজতে গিয়ে গরম তেলের বেরসিক সোহাগের ফলশ্রুতি।

আমার বাসরটা পণ্ড হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। বরং সেই বাসর হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অগ্নি-ঘন। জীবনের প্রথম বৈধ নারীর সান্নিধ্যে পেয়েছিলাম এক দুর্ধর্ষ প্রতিহিংসামুখর পরকীয়া স্বাদ। সেই রাতে আমি কোনো স্ত্রীর সান্নিধ্য ভোগ করিনি, পেয়েছি, উন্মত্তের মতো প্রতিশোধ গ্রহণের এক বিকৃত এবং দানবীয় প্রখর আনন্দ। ইংরেজিতে সেক্স ব'লে যা বুঝায় কিংবা বৎসায়নের *কামসূত্রে* কিংবা আদি সংস্কৃত সাহিত্যে রতি ব'লে যা বুঝায়, আমি পেয়েছিলাম তার উগ্র স্বাদ। কিছুটা বুঝতেও পারছিলাম যে এই ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু যথাযথ মুহূর্তে মেয়েরা পুরুষের পৌরুষের উগ্র প্রতাপকে খুব পছন্দ করে। রূপার হৃদয় কানায় কানায় ভ'রে গেল।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া শুরু হলো সকালেই। শূন্যতাবোধ, অপরাধবোধ, এবং তাৎক্ষণিক বিকৃতি থেকে উদ্ভূত অপূর্ণতাবোধ এবং বিবেক-তাড়না আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল। কী অপরাধ আমি করেছি যার জন্য আজ আমি বাসর রাতেই জেনা করছি? আমার এত সুন্দর চাঁদের নাভির পাশে একটা কলঙ্ক কেন? নিজেকে এসব প্রশ্ন করতে গিয়ে বুকের মধ্যে খিঁচুনি আসছে, জিহ্বা শুকিয়ে আসছে।

মনে হতে লাগল আমার মতো অসহায় এবং বঞ্চিত পৃথিবীতে হয়তো আর কেউ নেই। এই-ই যদি আমার প্রাপ্য হবে, তাহলে এত সাধনা ক'রে নিজেকে এত পবিত্র রেখে লাভ কী হলো?

অবশ্য ছোটবেলা থেকেই আমি ছিলাম মুটামুটি ঠাণ্ডা স্বভাবের। তাই ভাবলাম, মনটাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে ক্ষোভটাকে প্রকাশ করা চাই। বুকের আগুন বের ক'রে দিতে হবে। কার ওপর রাগটা ঝাড়া যায়?

বাড়ি ছুটে এলাম। মায়ের কাছে জানতে চাইলাম বিয়েটা কিভাবে ঠিক হয়েছিল। জানতে পারলাম ঘটনার মূল নায় ইরাজ।

মুহূর্তের মধ্যে আমার স্মৃতিতে সব পুরনো ঘটনার গল্প দ্রুত মঞ্চায়িত হয়ে গেল। সব রহস্যের ব্যাখ্যা পেলাম। নিজের অজান্তেই ব'লে ফেললাম, ইরাজ! তোকে আমি খুন করব!

একটু পরেই ইরাজের বাড়ি থেকে একটা লোক এল। তার ওপর চড়াও হব এমন সময়ে সে আমার হাতে একটা চিঠি দিল, যা খুলে সঙ্গে সঙ্গে পড়া শুরু করলাম:

দোস

যা জেনেছিস তার ফাঁদে আটকা পড়িস না। কিছু কিছু জ্ঞান মানুষকে দুঃখ দেয়। আমাকে ক্ষমা ক'রে দিস। জ্ঞানে ক আমি এত ভয় করি যে একটা জিনিস আমি কখনও জানতে চাই না। এবার আমার প্রথম ভুলের জন্য আমি তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি—তবে ভুলটা আমাকে করতেই হবেঃ খুন আমি করবই এবং আজ রাতেই। রূপাকে ভালোবাসিস।

ইরাজ

চিঠিতে তারিখ লেখা ছিল গত পরশু দিনের। আগন্তুকের কাছে যন্ত্রের মতো দ্রুতগতিতে জানতে চাইলাম, "কাকে খুন করেছে?"

জবাব এল, "নিজেকে।"

আমার শিরা-উপশিরায় রক্ত-প্রবাহ শান্ত হয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলাম রূপার কাছে। ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে সারা পৃথিবীর আদর ওর বুকে ঠোঁটে চোখে মেখে দিলাম। ওর জন্য পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। ওর জন্য আমার বুকের মধ্য থেকে দরদর ক'রে শীতল ধারায় নেমে এল মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমা। রূপা তার দেহ-মনের সবটুকু কৃতজ্ঞতায় আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলল, "তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বামী"।

কিন্তু ইরাজের আত্মহত্যার ব্যাপারে রূপাকে কী বলা যায় সে ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আবার ছুটে গেলাম বাড়ি। মা-বাবাকে ডেকে বললাম ইরাজের আত্মহত্যা ব্যাপারটা রূপা যেন না জানে। তাকে যেন বলা হয় যে সে সাপের কামড়ে মারা গেছে। মিথ্যে কথা কেন বলতে হবে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হলে যুক্তি দেখালাম যে ইরাজ এক সময়ে রূপার গৃহশিক্ষক ছিল। বিয়ের আয়োজনের মূলেও ছিল সে। অথচ বিয়ের আগের রাতেই সে আত্মহত্যা করেছে একথা রূপা জানতে পারলে সে ভাববে যে মনে মনে রূপাকে সে অত্যন্ত ভালোবাসত যা সে কখনও মুখ ফুটে বলতে পারেনি। তাতে রূপার মনে শুরু থেকেই জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। আমার যুক্তি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হলো।

রূপাকে ইরাজের মৃত্যুসংবাদটা আমিই দিলাম। অপরিমেয় চোখের পানি দুজনেই ভাগ ক'রে নিলাম। তাতে আমার প্রতি রূপার কৃতজ্ঞতা আরো বাড়ল। তাকে বুঝতে দিলাম না কী গোপন সত্যকে আমি জেনেছি। প্রথমেই তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার কোনো গৃহশিক্ষক ছিল কি না। সে মিথ্যে বলেনি। তখন তাকে জানালাম যে সে ছিল আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং তার পর তাকে দুঃসংবাদটা দিয়েছিলাম।

৬

সত্যকে যত গোপন রাখতে চাওয়া হয়, তা তত কঠোর হয়ে ওঠে। সেই কঠোরতা নিষ্ঠুরতায়ও রূপ নিতে পারে। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রূপার নাভীর পাশের সাদা দাগটা আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল। ওকে নিশ্চিহ্ন না করতে পারলে আমি যেন ইরাজের জন্য আর কাঁদতেও পারছিলাম না। সাত-আট মাস পরে রূপাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার বললেন, "সামান্য জিনিসের জন্য অত টাকা

খরচ করবেন?” ডাক্তারকে পুড়িয়ে মারতে ইচ্ছে করছিল। জিনিসটা সামান্য কি-না তা বলার অধিকার ওনাকে কে দিল? কিন্তু মুখে বললাম, “আমার স্ত্রীর সৌন্দর্য আমার কাছে অসামান্য একটা ব্যাপার। বরং টাকাই আমার কাছে সামান্য।” শুনে রূপার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, অথচ এতক্ষণ তা ছিল মলিন। বুঝতে পারছিলাম সে অতীতকে ভুলে যেতে চায়। ‘পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বামীটাকে’ সে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসতে চায়। তার প্রতি অবিচার সত্ত্বেও আমার প্রতি তার এই কৃতজ্ঞতা আমাকে তার প্রতি আরো কৃতজ্ঞ ক’রে তুলল। কিন্তু তবুও দাগটার সাথে কোনো আপোস করতে পারলাম না। সিঙ্গপুর গিয়ে সার্জারীর মাধ্যমে রূপার কলংকের দাগ ধুয়ে-মুছে তাকে পবিত্র ক’রে নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

৭

কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি যে এত দিনে নিজের অজান্তেই আমি এক জাতীয় মানসিক রোগীতে পরিণত হয়েছি। রূপার মতো আমিও যে ইরাজকে ভালোবাসি তা এখন বড় বেশি অনুভব করতে লাগলাম। রূপার অপরূপ নাভীটাকে প্রতিদিন দেখি, অথচ ইচ্ছে ক’রেও আর কোনোদিন সেই দাগটাকে দেখতে পারব না। মনে বড় কষ্ট হতো, “ইরাজ, তোকে আমি সত্যি সত্যিই খুন করেছি। রূপার জীবন থেকে তোকে নিশ্চিহ্ন করতে গিয়ে তোকে আমি আমার জীবনে টেনে এনেছি। তুই শুদু রূপার মনটাকে চেয়েছিলি। আমি চেয়েছি শুধু তার দেহটা।”

আমার অনুতাপ কয়েক মাসের মধ্যেই পাপবোধের পর্যায়ে উঠে এল। আর সহ্য করতে পারছি না। অনেক গোপন কথার মধ্যে কিছু একটা প্রকাশ করতে হবে। বুকটাকে খালি ক’রে ফেলতে হবে। এক রাতে প্রেমনিবিড় অবস্থায় রূপাকে ইরাজের মৃত্যুর আসল ঘটনাটা বলার জন্য মনস্থির করলাম। অত বড় ভালোবাসার ইতিহাস প্রাত্যহিক সাংসারিক সমৃদ্ধির তলে ঢাকা পড়ে থাকবে—এ হতে দেয় যায় না। কাউকে তার ইতিহাস থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। ইরাজকে হারিয়ে রূপা জীবদ্দশাতেই তাজমহল হয়েছে, অথচ সে তা জানবে না? আমার কাছে মনে হতে লাগল, ইরাজের মৃত্যু-সংবাদটাই রূপার জীবনের সবচেয়ে মৌলিক অধিকার। তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না। বাহুলগ্ন রূপাকে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, “রূপা, তোমাকে একটা কথা বলব।”

“একটা কেন, হাজারটা বল। তার জন্য আবার পূর্বাভাসের দরকার আছে নাকি?”

“কিছুটা আছে। কারণ কথাটা শুনে তোমার একটু খারাপ লাগতে পারে। যা ঘটেছিল তার জন্য খারাপ না লাগলেও সে ব্যাপারে তোমাকে আমি আগে মিথ্যা বলেছিলাম কেন সেজন্য খারাপ লাগতে পারে।”

“তুমি আমাকে কখনও মিথ্যা বলেছ?”

“একবার।”

“কী সে ঘটনা?”

“ইরাজের মৃত্যু।”

“সে তাহলে বেঁচে আছে?”

“না।”

রূপা আর প্রশ্ন করল না।

“আসলে আমাদের বিয়ের আগের রাতেই সে আত্মহত্যা করেছিল। কেন তা কেউ জানতে পারেনি।”

রূপা তার পরও কোনো প্রশ্ন করল না। সে নিরব হয়ে গেল। চোখ দুটো বন্ধ ক'রে রাখল। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম না।

“আমাদের বিয়ের আয়োজনটা ও-ই করেছিল। ওর ওপর আমার এত আস্থা ছিল যে বিয়ের আগে আমি তোমাকে দেখতেও চাইনি। বিয়ের ক'দিন আগে ও ওর অসুস্থ মাকে দেখতে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। সম্ভবত ওর মনে কোনো চাপা পারিবারিক কষ্ট ছিল, যা আমাকে কখনও বলেনি।”

রূপা একেবারে চুপসে গেল। মনে হলো সে শুকিয়ে আরো ছোট হয়ে গেছে। বুঝলাম এ অবস্থায় দুজনে গ্রন্থিবদ্ধ থাকার কোনো মানে হয় না। আমি উঠে বারান্দায় চ'লে গেলাম।

তারপর থেকে রূপা যেন পাল্টে যেতে লাগল। টের পাচ্ছিলাম সে দিন দিন তার নিজের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। একটা মানুষের পুরো সত্তাটাই যদি তার নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তাহলে সে অন্য কোনো মানুষের কোনো কাজে আসে না। মানুষের সৃষ্টি তার নিজের হৃদয়ের গোপন গুহায়, তাই তার বিকাশ বহির্মুখী। নিজেকে বের করতে না পারলে তখন নিজেকেই নিজের জীবনের কাজে লাগানো যায় না। ভাবলাম রূপাকে তার মধ্য থেকে বের করা চাই। কিন্তু ততদিনে একই সমস্যা যে আমাকেও অনেকটা পেয়ে বসেছে তা আমি কিছুটা বুঝতে পারছিলাম। তাই সাইকো-এনালিসিসের পথ অবলম্বন করতে চাইনি। আমার নিজস্ব অপসৃয়মাণ গোপন সত্তাকেই আমি ভয় পাচ্ছি। তাকে আমি নিরবে বুকের শীতল অন্ধকারে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। তাই ঠিক করলাম, সে ব্যাপারে আর কোনো আলাপ না ক'রে রূপাকে নিয়ে বিদেশে ঘুরতে যাব।

হাওয়ায় যখন সমস্যা থাকে তখন হাওয়া পরিবর্তন করলে সে সমস্যা দূর হয়। কিন্তু সব সমস্যাই যখন থাকে মনের মধ্যে তখন নোতুন হাওয়া তার সবটুকু ধুয়ে মুছে সাফ করতে পারে না। তবু প্রবাস-ভ্রমণের কয় দিন উভয়ে কিছুটা ভালো ছিলাম। রাতে ঘুমিয়েছি ভালো। তবে পারস্পারিক নৈশ-ঘনিষ্ঠতা ছিল বিরল। হয় রূপা তার মনের মধ্যে দেহটাকে হারিয়ে ফেলেছে, কিংবা তার দেহটা এখন আর তার নেই। মেয়েরা যাকে মন দেয়, দেহটাকে তার জন্য রেখে দিতে চায়। আমার জন্য তার দেহটা এখন পারিবারিকতা-এবং কৃতজ্ঞতা-নির্ভর বন্ধুত্বের সাময়িক উপহারমাত্র। তার পেছনে আগ্রহের চেয়ে প্রয়োজনের তাগিদটা বেশি কাজ করেছে।

দেশে ফেরার পর রূপা আরো বেশি বদলে যেতে লাগল। এখন আমাদের মধ্যে দূরত্ব এত বেশি হয়েছে যে আমরা আর একত্রে কাঁদতে পারি না। মানুষের পারস্পারিক ভেদাভেদকে মিলিয়ে নেয়ার একটা বড় উপায় হলো একত্রে কাঁদতে পারার যোগ্যতা, আনন্দ করার নয়। সুতরাং অনুমান করতে পারলাম যে, প্রবাসের যৌথ আনন্দের কৃতিত্ব ছিল প্রবাস-যাপনের, মনের নয়। এখন দেশে ফিরে তার প্রমাণ পেলাম। অসম্পূর্ণ মন যখন ঘরে ফেরে, তখন সে বাইরের অসম্পূর্ণতাও ঘরে বয়ে নিয়ে আসে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে অফিস থেকে ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করত না।

রূপার আত্মমগ্নতা এক পর্যায়ে স্বার্থপরতার রূপ ধারণ করতে লাগল। আমার মা-বাবাকেও তার এখন আর সহ্য হচ্ছিল না। অথচ তাদের সাথে তার এতকালের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর।

সংসারে অশান্তির নোতুন মাত্রা যুক্ত হলো।

কথা-কাটাকাটি ঝগড়া-ঝাটি হওয়া শুরু হলো। মাঝে-মধ্যে তার গায়ে হাত তুলতেও বাধ্য হলাম। দুজনে আলাদা বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করলাম। দিনের পর দিন আমি সস্ত্রিক শয্যা-যাপন থেকে বঞ্চিত। অতৃপ্ত বাসনার বিষ আমার আলাপ, চিন্তা, আচরণ এবং সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রকে বিষাক্ত ক'রে তুলল। রূপা আমাকে আর স্বেচ্ছায় কাছে ডাকে না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর খাটালে একটা পর্যায়ের পর অবশ্য সে বাঁধা দেয় না। তবে যৌনতাকে আমি স্বাভাবিকভাবেই একটা মহান কাজ ব'লে মনে করতাম। সে মহান কাজে জবরদস্তি আমার কাছে পছন্দনীয় ছিল না। অবশ্য জবরদস্তির প্রয়োজন যদি হতো তার শারীরীক উস্কানীর এবং নেশার জাগরণের প্রয়োজনে—যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবশ্যকও বটে—তাহলে তাতে আমার কোনো আপত্তি থাকত না। নারীর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে এবং এভাবে তাকে হারিয়ে দিলে নারী তার প্রচেষ্টাকেই সার্থক মনে করে, কেননা সে চেষ্টা ক'রেই পরাজিত হতে ভালোবাসে, কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে নিজেকে অপরাধী ব'লে মনে হয়। সেই তাৎক্ষণিক উগ্রতা এক জাতীয় পাশবিক আনন্দ দেয়, যা, অন্তত এক জন সুস্থ মানুষের মনে, পরবর্তীতে প্রখর আত্মপীড়নের জন্ম দেয়। এ কারণে নিজের আগুনকে নিজের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখতাম। এমনকি, যে-যৌবনকে আমি এতদিন মহান ভেবে এসেছি, তার প্রতিও তীব্র ঘৃণাবোধ এসে গেল। পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনাকে এড়াবার জন্য আক্ষরিক অর্থে এবং ব্যবহারিক কায়দায় ধার্মিক হয়ে উঠলাম। অবশ্য চিন্তায় এবং স্বভাবে আমি আগে থেকেই ধার্মিক ছিলাম।

৯

মাঝে মাঝে মনে হতো, রূপার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য আজ শেষ চেষ্টা ক'রে দেখব। অফিস থেকে বাসায় ছুটে যেতাম। নিঃশর্ত তার কাছে যাবতীয় রূঢ় আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতাম। বুকের মধ্যে এনে আদর করতাম। কখনো কখনো মন ভাঙানো যেত। তবে তা ছিল সাময়িক। সব খণ্ড আনন্দের পরপরই পারস্পারিক

সম্পর্কে আবারও নিরানন্দ নেমে আসত। তার কারণ হিসেবে দেখাবার মতো অনেক অজুহাত তার ছিল। "মুখ ভার ক'রে আছ কেন?" বললে সে সচরাচর প্রথমত বলত "কই না তো।"

"দেখাই তো যাচ্ছে।"

"নাই বা হাসলে। তাই ব'লে মুখ ভার ক'রে থাকবে নাকি? আমাদের তো কোনো সমস্যা নেই। আমরা তো সুখী পরিবার।"

"ছাই পরিবার।"

"একথা তুমি বলতে পারলে? আগে তো বলতে না।"

"আগে তো তুমি আমার সাথে দুর্ব্যবহারও করতে না।"

"তুমিও তো আমার সাথে দুর্ব্যবহার কর। কী, কর না?"

"তুমি বাধ্য কর।"

"আচ্ছা, বুঝলাম দোষ আমার। তাহলে ক্ষমা ক'রে দাও।"

"তোমার অন্যায় করার অধিকার আছে। তুমি স্বামী। আমাদের মেয়েদের সব সহ্য করা উচিত। ক্ষমা করার মতো যোগ্যতাও আমার নেই।"

"আহ, রূপা, তুমি ব্যাপক বিষয়ে সিদ্ধান্ত টেনে কথা বলছ কেন? আমি কি তোমার সাথে এমন আচরণ করি যার জন্য স্রেফ আমাকে দিয়েই তুমি পুরো পুরুষ এবং নারী জাতির পারস্পারিক সম্পর্কের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছ?"

"তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না। তুমি বল কী করতে হবে। সব করব। কাজে আমার আপত্তি নেই। দাসীরা কাজ ক'রেই খায়।"

"রূপা, তুমি এত নিচে নেমে গেছ? এ কি নারীবাদী আন্দোলন থেকে তোমার শেখা বুলি? নারীবাদী আন্দোলন যদি নারীকে এই শেখায়, তাহলে তা আদৌ সফল হবে না। সত্যিকারের নারীরাই তাকে ব্যর্থ ক'রে দেবে।"

"আমি কোনো আন্দোলনের কথা বলছি না।"

“ও, সরি। ...আচ্ছা রূপা আমিও তো একটা মানুষ। আমার দেহটা তো রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া.... ।”

“বুঝেছি কী বলতে চাচ্ছ। আমি তোমার বিছানার পুতুল। আমাকে নিয়ে যেভাবে খুশি খেলতে পার। নিষেধ করিনি।”

আসলে তার অস্বাভাবিকতার স্পষ্ট কারণ ছিল, যার ফলে সে সবকিছুরই একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাত। বুঝতে পারতাম সে মুখে যা বলছে সব সত্য নয়, তবে বলার উদ্দেশ্যটা সত্য। অবস্থার কবলে প'ড়ে নিজেও এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে কী করলে এই জটলা খোলা সম্ভব তা মাথায় আসত না। কিন্তু আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল এক দিনের ঘটনায়।

এক দিন প্রচণ্ড আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে বেলা তিনটার দিকে বাসায় ফিরেছি। তখন বসন্তকাল। ঐ সময়ে সচরাচর কখনও বাসায় ফিরতাম না—ফিরলে হয় লাঞ্চের আগে না হয় বিকাল পাঁচটায় বা ছ'টায়। ব্যাসায় গিয়ে দেখি রূপা ঘুমিয়ে আছে। কাজের বুয়া দরোজা খুলে দিল। আমি সন্তর্পণে রূপার পাশে গিয়ে বসলাম। নীল শাড়ি প'ড়ে এত চমৎকারভাবে সে সেজে-গুজে শুয়ে আছে যে তাকে দেখেই চোখ দুটি জুড়িয়ে গেল। অমন সাজে তাকে বাসর রাতে ছাড়া আর কখনও দেখেছি কি না মনে পড়ে না। ডান পাশে কাত হতয়ে শুয়ে আছে। ননীর মতো কোমল হলুদাভ মসৃণ পেটটা বের হয়ে আছে। নীল শাড়ির বিপরীত আভা তার ত্বকের আভাতে এক অপূর্ব মোহনীয় স্বর্গীয় দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়েছে। বুকের ওপর দিয়ে শাড়ির পাড়টা একটু নেমে গেছে—তার সীমানা ডিঙিয়ে তার ভরাট বুক যেন ব্লাউজ ফেটে বের হয়ে আসতে চাইছে। অসম্ভব সুন্দর মুখখানা যেন কোনো এক অপ্সরার মুখ—মর্ত্যের মানবীয় নয়। কোমরের ভাঁজের নিচে ভারী নিতম্বের পাহাড়ী দৃশ্য। শ্রাবণের সমৃদ্ধ নদীর মতো বাঁকে বাঁকে সজীব দৃশ্যাবলী নিয়ে ঘুমিয়ে আছে এক নোতুন রূপা। বুকের মধ্যে হু হু ক'রে উঠল। নিঃশব্দে তার কাছে বসলাম। নিটোল নাভীটার অলৌকিক দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম: নাভীর পাশে যথাস্থানে সাদা ক্রিম দিয়ে একটা গোলগাল কৃত্রিম দাগ আঁকানো!

মুহূর্তের মধ্যে অর্থ আর অনর্থ মাথার মধ্যে এক জায়মান অনুভূতির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেল। স্পষ্টভাবে মাথার মদ্যে কোনো অর্থপূর্ণ ভাবনা ভাবতে

পেরেছিলাম কি না জানি না। তবে মুহূর্ত বলে দিয়েছিল আমাকে কী করতে হবে। আমি বুনো আকাঙ্খা নিয়ে পোষা হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ধারাবাহিক স্বয়ংক্রিয়তায় সেই কৃত্রিম ক্ষতস্থানের বৃত্তাকার প্রতীকটাকে চেটেপুটে খেতে শুরু করলাম।

রূপা নিরব রইল। মুহূর্তের আশীর্বাদটাকে সে দুচোখ ভ'রে তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

আমি অশরীরী আত্মার মতো তার সারা দেহের কুঞ্জবনে বিচরণ করতে লাগলাম। কিন্তু তার দেহের স্বয়ংক্রিয় সাড়ার দিকদর্শন প'ড়ে মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে ফেললাম প্রতিবার আনন্দের ফসল ফলানের জন্য আমাকে কোত্থেকে চাষাবাদ শুরু করতে হবে। আমার কেন্দ্রেই আমাকে বারবার ফিরে যেতে হবে। তার দেহ-মনের প্রতিটা অনুভূতির ঢেউ উঠে আসছে সেই নাভিমূল-সংলগ্ন কল্পিত ক্ষতস্থান থেকে। সুতরাং আমার যাবতীয় জাগতিক আরধনা ওখান থেকেই শুরু হওয়া উচিত। ওই একরত্তি একটু জায়গা এখন রূপার সত্তার কেন্দ্রবিন্দু। ওখান থেকেই তার নবজন্ম। ওর মধ্যেই হারিয়ে গেছে অতীতের সহস্র দিনের সহস্র খণ্ড খণ্ড রূপা। তৃপ্ত রসনাপুটে ওখানেই আমাকে রাখতে হবে আমার উষ্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলী।

আমি রূপাকে তার ক্ষতচিহ্ন সহ গ্রহণ করলাম।

রূপা আমাকে তার অখণ্ড সত্তার সাথে মিলিয়ে নিল।

আমি জীবনের প্রথম পরিপূর্ণ প্রশান্তির সাগরে ভেসে গেলাম।

রূপার হৃদয়ের গভীরে এখন উজ্জ্বল হয়ে ঘুমিয়ে আছে একটা ক্ষতচিহ্ন—তার মধ্যে বিলীন হয়ে আছে আমার আমিত্ব। রূপা যদি ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে সেই ক্ষতস্থানের মধে বেঁচে থাকতে আমার আর আপত্তি কিসের।

১০

আমাদের জীবন স্বাভাবিক হয়ে গেল। তা এখন একটা ক্ষতচিহ্নের দ্বারা সংজ্ঞায়িত। তবুও তা জীবন। ক্ষতচিহ্নের এই বিস্ময়কর শক্তিকে আবিষ্কার করতে পেরে আমি যে দিগ্বিজয়ের আনন্দ পেয়েছিলাম, নিউটন মহাকর্ষ বলে সূত্র আবিষ্কার করতে পেরে

কিংবা আর্কিমিডিস তরলের প্লবতাতত্ত্ব আবিষ্কার করতে পেরে অতটা আনন্দ পেয়েছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁদের আবিষ্কার একেকটা যুগকে জাগিয়ে তুললেও কোনো মৃত সংসারকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেনি। নারীকে বুঝার যোগ্যতাই নিউটনের ছিল না, নারীর ক্ষত তো দূরের কথা।

তার পর থেকে নিশাচর আর্টিস্টের মতো আমিই নিজের হাতে ক্ষতচিহ্ন আঁকার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমি দই মিষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদেয় বস্তু নিয়ে রূপার নাভির পাশে ধীরে ধীরে সেই ঐতিহাসিক ক্ষতচিহ্নের রহস্যময় প্রতীক গ'ড়ে তুলতাম, আর তারই সাথে সাথে বিধ্বস্ত রূপার মধ্যে অতীতের ধারাবাহিকতায় অসংখ্য প্রগল্‌ভ এবং সতেজ রূপার আবির্ভাব ঘটত। অতীতের সব রূপাকে আমি আমার চৌকষ আঙুলের যাদুকরী ছোঁয়ায় সময়ের গুহা থেকে তুলে আনতাম এবং সেই বিকলাঙ্গ সময়ের পূর্ণাঙ্গ অশরীরী উপস্থিতিকে রাহুর মতো গিলে ফেলতাম। রূপা তার সমগ্র অতীত নিয়ে আমার বুকের মধ্যে লুটিয়ে পড়তে চায়। তাকে আমি সময়ের নিষ্ঠুর ছুরি দিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে স্বার্থপরের মতো বেছে বেছে গ্রহণ করব কেন? কেউ যখন আম কেনে, তখন তাকে আঁটির জন্যও তো পয়সা দিতে হয়। এখন তো আর ক্ষতবিহীন রূপা পাওয়া সম্ভব নয়। রূপাকে আমি তার ক্ষত-সমেত গ্রহণ করতে শিখলাম। দেবতারা সাগরমন্থর ক'রে বিষ পেয়েছিলেন। আমি বিষ মন্থন ক'রে সাগর পেয়েছি। দেবতাদের আমাকে দেখে লজ্জা পাওয়া উচিত।

১১

কিন্তু দেবতাদের মধ্যে কামদেব একটু বেয়াড়া স্বভাবের। অন্যান্য দেবতারাও তার তাড়নায় অতিষ্ঠ। তিনি মাঝে মাঝে বেঁকে বসেন। মাঝে মাঝে তাঁর কোনো অঙ্গ থাকে না। তিনি তাই যৌনাঙ্গ বাদ দিয়েও অন্যান্য অপ্রস্তুত অঙ্গের মধ্যে এসে কখনো কখনো আবির্ভূত হন। এ কারণে তাকে অনঙ্গদেবও বলা হয়ে থাকে। কামদেব কিছুকাল পর রূপাকে অঙ্গ-সচেতন ক'রে তুলল। তবে একটু ভিন্ন কায়দায়। এখন রূপার দাবী, আমি সুস্বাদু ক্ষত চেটে খেতে পারলে কুৎসিত ক্ষতও আমার খেতে পার উচিত। আমি তার প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হলাম। প্রস্তাবটাকে সে রেখেছিলো কৌশলে, "দাগটা দেখতে কুৎসিত হলে তা কি তুমি খেতে?"

বুঝতে পারলাম বিবেচনা ক'রে এ কথার জবাব দিলে আবার আগের জীবনে ফিরে যেতে হবে। তাই তৎক্ষণাৎ বললাম, "পারব না মানে?"

“সুস্বাদু না হলে। যেমন তিতা হলে?”

“অবশ্যই পারতাম।”

“বিশ্বাস হয় না।”

সুতরাং তাকে বিশ্বাস করানোর গুরুদায়িত্ব আমাকেই মাথা পেতে নিতে হলো।

যৌবন কুৎসিত। অথচ তার মধ্যেই মানুষের জন্য মহান আনন্দের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার মাধ্যমেই বংশধারা টিকে থাকছে। প্রলম্বিত হচ্ছে মানব জাতির আবয়বিক কাঠামো। টিকে থাকছে আশরাফুল মাখলুকাত। বিকৃত যৌবনের সাথে বিস্বাদ ক্ষতের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। অতীতে এবং বর্তমানে অসংখ্য আশরাফুল মাখলুকাত বিকৃত যৌনাচারে আনন্দ পেয়েছে। অনুমান করা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে এই প্রবণতা আরো বেশি শক্তিশালী হবে। এই যদি হয় বাস্তবতা, তাহলে আমি কেন পারব না? তাছাড়া আমি তো চাচ্ছি এক জনকে আনন্দ দিতে। একটা সংসারকে বাঁচাতে। ফলে দই মিষ্টির বদলে আমাকে আশ্রয় নিতে হলো কলমের কালি, লিপষ্টিক, নিমের পাতার রস ইত্যাদির।

রূপা দিন দিন আরো সতেজ হয়ে উঠতে লাগল।

দাগটা এখন আর নাভীর পাশেই রইল না, তা বসন্তের মতো ছড়িয়ে পড়ল রূপার সারা দেহে। আমাকে তার নিটোল সুপুষ্ট দেহে মোজাইকের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আকা অংকিত যাবতীয় ক্ষতচিহ্নগুলোকে একনিষ্ঠ আগ্রহে একের পর এক সাবাড় করতে হতো—ঠিক যেমন চৈত্রের উজাড় মাঠে একাকী ইঁদুর আত্মমগ্ন হয়ে খুঁটে খায় পরিত্যক্ত শস্যকণা।

১২

আমাদের দিনগুলো চমৎকারভাবে কাটতে লাগল। ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকলেও ক্ষতকে অস্বীকার করিনি। ক্ষতকে অস্বীকার করলে তো নিজের সত্তার এক বিশাল অংশকেই অস্বীকার করতে হয়। ক্ষতবিহীন পশু পাওয়া যায়, যার ফলে শরীয়া অনুসারে কোরবানী দেয়া সম্ভব হয়, কিন্তু ক্ষতবিহীন মানুষ পাওয়া যায় না, ফলে মানুষ

কোরবানীর বিধান থাকলে তা কখনও কার্যকর হতে পারত না—ইসমাইলকে কোরবানী হতে না দিয়ে আল্লাহ্ পাক তাঁর সর্বজ্ঞতার একটা চমৎকার নিদর্শন রেখেছেন। একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায়, পশুর দৈহিক ক্ষতের কোনো সমতুল মানুষের মধ্যে খুঁজতে হলে তাকে হতে হবে মানসিক বা চারিত্রিক ক্ষত। তা না হলে মানুষকে আশরাফ কেন বলা হবে?

এই ভাবে আরো তিন বছর কেটে গেল। আমরা সুখী দম্পত্তি। সব ঠিকঠাক চলছে। আমাদের মোট দাম্পত্য জীবন পাঁচ বছরের চেয়ে বেশি সময়ের। তার মধ্যে সবটুকু সময়ে আমরা বেঁচে ছিলাম না। একটা মানুষ তার জীবনের সবগুলো মুহূর্তে সমানভাবে বেঁচে থাকে না। কখনো কখনো তাকে মৃত্যুর মধ্যেও বেঁচে থাকতে হয়। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হতো, আমরা আমাদের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ার মধ্যে মৃত্যুকে মঞ্চায়িত করছি না তো?

আরো এক বছর কেটে গেল। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। আমি এখন শুধু আমার রূপাকেই পাইনি, ইরাজের রূপাকেও পেয়েছি। তা হয়তো আমার জন্য নৈতিকভাবে অশোভন, তবে আইনগতভাবে তা বৈধ। সামাজিক বৈধতাই আমাদের হারাম-হালালের বিচারের মাপকাঠি। ফলে নিজেদেরকে বেশি প্রশ্ন না করলেও আমাদের চলে। আমি যে-অপরাধ করছি তার জন্য আমার কখনও বিচার হবে না। তাহলে বিচারের আগে আমি কেন বিবেকের সাজা খাটতে যাব? ভালোই তো আছি।

১৩

কিন্তু রূপা আবারও পাল্টে যেতে লাগল!

আমি তো আমার রূপা এবং ইরাজের রূপা উভয়কেই পেয়েছি। আমার জন্য তা বাড়তি পাওয়া। এক বিয়েতে দুই স্ত্রী—অথচ দুটোই বৈধ! আমার এই অতিরিক্ত পাওয়না তাকে ইর্ষান্বিত ক’রে তুলল। আমি যদি আমার রূপার মধ্যে ইরাজের রূপাকে পেতে পারি, তাহলে সে কেন আমার মধ্যে ইরাজকে পেতে পারে না? তার এই আকাঙ্খার কথা বুঝতে পেরেছিলাম তার কথা থেকেই।

এক রাতে আনন্দঘন মুহূর্তে রূপা আমাকে বলল, "তুমি অনেক পাল্টে গেছ।"

ভয় হচ্ছিল, না জানি আবার কোনো অভিযোগ তৈরি হবে কি না। সচরাচর আমরা ধ'রে নেই পাল্টে যাওয়া মানে কমপক্ষে এক ধাপ নেমে যাওয়া।

"কেমন পাল্টে গেছি?"

"তুমি আগে ছিলে রোগী। এখন হয়েছ ডাক্তার।"

"সে কেমন?"

"আগে তুমি আশ্রয় চাইতে। এখন তুমি আশ্রয় দিতে পার। ক্ষত সারানোর ক্ষমতা তোমার আছে।"

রূপার কথার ইঙ্গিত কোনদিকে তা আমি কিছুটা বুঝতে পারছিলাম, তবে সে 'ক্ষত' শব্দটাকে উল্লেখ করতেই আমার আর সন্দেহ রইল না যে আমি যা বুঝেছি তা সত্য। একটা চমৎকার ব্যাপার হলো এই যে, ক্ষতের সৃষ্টি এবং আরোগ্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন-নাটকের একই দৃশ্য বিভিন্নভাবে মঞ্চায়িত হতে থাকলে।ও তা নিয়ে আমরা এতদিন কেউ আলাপ করিনি। বিশেস ক'রে তার ইতিহাস আমরা কেউই ঘাটতে যাইনি। রূপার ভাবার কোনো সঙ্গত কারণই নেই যে তার ক্ষতচিহ্নের ইতিহাস আমি জানি। বিয়ের অব্যবহিত পরে কিছুকাল যাবত রূপা নিজেও তা ভুলে ছিল। আর সততার সাথে আমি বলতে পারি যে, সে ক্ষতকে আমি স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ ক'রে নিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো ঘটনা যখন অতীত হয়ে যায়, তখন মানুষ তাকে নোতুন অর্থ দিতে শেখে—ঘটনাটা যদি হয় নিজের, তাহলে সে তার প্রতি এক জাতীয় মহত্ব আরোপ করে এবং সুযোগ থাকলে তাকে সে তার আত্মজীবনীতে যথাযথ মর্যাদা এবং গুরুত্ব সহ স্থান দেয়, এবং তা যদি হয় প্রতিপক্ষের, তাহলে সে তার প্রতি এক জাতীয় ঐতিহাসিক নিন্দা আরোপ করে এবং নিজের স্বার্থোদ্ধার হবে জানলে সে তাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়ে ধ্রুপদী কলংক হিসেবে চিহ্নিত ক'রে তার সাথে নিজেকে তুলনা করার মাধ্যমে ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যকে তুলে ধরার পথ সুগম ক'রে রাখে। আমাদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা পরবর্তীতে কিচুটা এই রাজনৈতিক চরিত্র পেয়েছিল। রূপা তার বর্তমানকে বিচার করতে চাইত তার অতকীতের মাপকাঠি দিয়ে। তার আচরণ থেকে

বুঝা যেত যে, তার বর্তমান কেমন তা সে না জানলেও তার অতীত কেমন হতে পারত সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত এবং সে ব্যাপারে তার কোনোই সন্দেহ নেই। মানুষ মানুষ যাকে বেশি স্পষ্টভাবে জানে ব'লে মনে করে, তার সাথে সে তার অস্তিত্বকে বেশি গুরুত্বের সাথে সম্পৃক্ত করতে চায়, যদিও এমনও হতে পারে যে তার অস্তিত্বের সাথে উক্ত বিষয়ের কোনো নিবিড় সম্পর্ক নেই। সেকুলারিজ্‌ম, ইমপিরিসিজ্‌ম, ম্যাটেরিয়ালিজ্‌ম, হেডোনিজ্‌ম, এপিকিউরিয়ানিজ্‌ম ইত্যাদি মতে বিশ্বাসী লোকের এ কারণে মনে করে যে তাদের জ্ঞানই তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে, এবং তাদের অস্তিত্বের বিশেষ রীতি তাদের জ্ঞানকে নির্ধারিত করছে না। আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল কি, রূপার অতীতকে আমি সহজে মেনে নিলেও নিজের বর্তমানকে মানতে পারছিলাম না। আমি ভাবতাম—যে-রূপাকে আমি আগে পেয়েছিলাম তাকে কি এখন পুরোপুরি রাখতে পেরেছি, এবং আগের রূপা যে-স্বামী পেয়েছিল, তাকে কি সে এখন পাচ্ছে? কিন্তু সম্ভবত আমার এই প্রশ্নই সঠিক ছিল না, কারণ তা হয়তো তার পাওয়ার দরকারও ছিল না। সে যখন ক্ষতচিহ্ন নিয়ে কথা তুলল, তখন বুঝলাম যে সে তার ইতিহাসকে ঘাটতে চায়, তবে নিজে নিজে নয়, আমার সাহায্য নিয়ে। একে বলে সাইকো-এনালিসিস। ব্যাপারটাকে কিছুটা আশাব্যঞ্জকও মনে হলো। কোনো কিছু নিয়ে প্রচুর কথা বলতে পারলে তার গুরুত্বকে কমিয়ে হাস্যকর পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায়। সরকারী আমলার আলোচনার টেবিলে জটিল এবং ঝামেলার জিনিসকে গুরুত্বহীন ক'রে তোলার জন্য এই কৌশল অবলম্বন ক'রে থাকেন। জাতিসংঘের 'শান্তি-মিটিং' সহ অন্যান্য 'মানবীয়' কর্মকাণ্ডের রুদ্ধদ্বার বা মুক্তদ্বার বৈঠকেও এই পদ্ধতি চমৎকারভাবে অবলম্বিত হয়। আসলে কোনো কালেই সমস্যা যেখানকার সমাধান সেখানে থাকে না। রূপার সমস্যা মনে, তাই তার সমাধান দরকার এই মুহূর্তের মন-বহির্ভূত ব্যাপারে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে। কিন্তু প্যাঁচ খুলতে গেলে উল্টো প্যাঁচ দিতে হয়। মনের মধ্যে যা আছে তা বের করতে হলে আগে জানতে হবে তাতে কী আছে। সেরূপ কোনো জিনিস বাইরে না দেখা পর্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা সম্ভব নয় তা কী। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, রূপা দেখতে চেয়েছিল আমার মধ্যে ইরাজ আছে কি না!

তা না থাকলে তার স্মৃতির ইরাজ যে মিথ্যে হয়ে যাবে।

আমি বিনাশ্রমে দুটো স্ত্রী পেয়ে গেলাম, সে কেন তাহলে দুই জন স্ত্রীর ভূমিকা পালন করার মতো গুরুদায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েও দুই জন স্বামী পাবে না? তার এই আকাঙ্খা ছিল আমার প্রতি তার প্রতিশোধস্পৃহা পূরণ করার দ্বিতীয় উপায়। এই

সত্যকে অনুমান করতে পেরে আমি তাকে জবাব দিয়েছিলাম, “তুমি মনে করছ যে ক্ষত সারানোর ক্ষমতা আমরা আছে। কিন্তু আসলে আমার তা নেই। যে-ব্যক্তির ক্ষত সৃষ্টি করার ক্ষমতাই নেই, তার সারাবার ক্ষমতার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই।”

“তুমি এত চমৎকার কথা বলতে পার!”

“থ্যাংক ইউ।”

মনে মনে বললাম, রূপা, যে ক্ষতের তৃষ্ণাই তোমার এখনও মেটেনি, তা আমি সারাব কিভাবে? ক্ষতচিহ্ন বয়ে নিয়ে বেড়াতে বাধ্য হওয়ার কষ্ট মানুষকে তার প্রতিদান পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ক'রে তোলে। আমি তোমার ক্ষতের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে তাকে নির্মূল ক'রে দিয়েছি, এখন সেই ক্ষত-দূরীকরণের দায়ে উপযুক্ত সেলামী দিতে হবে। মুখে বললাম, “দাগটা থাকলে ভালো হতো। আমি কেমন আহাম্মক ছিলাম যে চাঁদকে চেয়েছিলাম তার কলংক ছাড়াই। সামান্য একটা চিহ্ন আমার কাছে আমার প্রিয়তমার ইমেজকে ছোট ক'রে দিচ্ছিল। পরে যখন বুঝতে পেরেছি যে তা সামান্য নয়, তখন সত্যিই লজ্জিত হয়েছি।”

“কী ক'রে বুঝলে যে তা সামান্য নয়?”

রূপার চোকের সন্দেহপূর্ণ প্রশ্নটাকে আমি পড়তে পারলাম। ভাবলাম, মন্তব্যটা যখন করে ফেলেছি, তখন জবাবও একটা দিতে পারব। রাজনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দরকার, কারণ উদ্দেশ্য হলো সমাধান দিয়ে অন্য কোনো সমস্যাকে উস্কে দেয়া, তাকে নির্মূল করা নয়। রূপার অস্তিত্ব এখন সমস্যার অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। যৌবন এবং রাজনীতি মানুষের আদিমতম সঙ্গী। সমাজ-বিজ্ঞানীগণ যাই বলুন, আমার মনে হয় মানুষ প্রথম রাজনৈতিক কৌশলগুলো শিখেছিল তার নৈশশয্যা এবং দাম্পত্য জীবন থেকেই—স্ত্রীকে কিংবা গুহাসঙ্গীনিকে ম্যানেজ করতে গিয়ে তাকে তা প্রথম প্রয়োগ করতে হয়েছিল। পশু-শিকার করতে গিয়ে মানুয় যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিল বটে, তবে শুধু যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধকে টিকিয়ে রাখা যায় না; যুদ্ধই যুদ্ধকে খতম করে, যদি না তাতে রাজনীতির উপাদান জড়িত থাকে। পশু শিকারের মতো নারী শিকারের সফলতাও ছিল যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শিতার ফল, কিন্তু ‘নারী বিজয়’ শুধু যুদ্ধের ব্যাপার নয়, তাতে রাজনীতি থাকতেই হবে। বললাম, “চাঁদ যদি সামান্য

না হয়, তাহলে চাঁদের কলংক সামান্য হয় কিভাবে? সম্ভবত কলংকের উপস্থিতির জন্য আমরা চাঁদকে চাঁদ বলি।”

আমার কথার মধ্যে রূপা একজন বিচক্ষণ রাজনীতিকের মতো অদূর ভবিষ্যতের আশার আলো দেখল। রাজনীতিকরা অদূর ভবিষ্যতকে বড় ভালোবাসেন, দূর ভবিষ্যত ভালো শুনায় কেবল তাত্ত্বিক উচ্চারণে—তাও যখন সমাজবিজ্ঞানের অনুষঙ্গ না টানলেই নয়, তখনই কেবল তারা দূরের কথা বলেন। রাজনীতিকরা এবং মেয়েরা মুখে দূরের কথা বললেও তাকায় অদূরে। আমি আরো বললাম, “আমি তোমার ক্ষত সেরেছি কিন্তু ক্ষতিটা পূরণ করতে পারিনি। এক্ষেত্রে আরোগ্যটাই ছিল বড় ক্ষতি।”

“কিন্তু ডাক্তার তো শুধু রোগ সারাতে পারে, রোগ সৃষ্টি করতে পারে না,” কথাটা ব'লে রূপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

সে আবারও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

খানিক পর সে নিস্পৃহ হয়ে বিছানায় নেতিয়ে পড়ল। আমরা যে-উষ্ণতা সৃষ্টি করেছিলাম, তাকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে পারলাম না।

১৪

আমার সাইকো-এনালিসিস সমস্যাকে চিহ্নিত করেছে শুধু, উস্কে দিতে পারেনি। সাইকো-এনালিস্টের কাজ হলো সমস্যার ভিতরে ঢুকে পড়া, তাকে পরিমাপ করা নয়। আর সমস্যাকে উস্কে না দিলে তার ভিতরে ঢুকে পড়াও সম্ভব নয়। এখন কী করা?

ফলে আবারও আগের পন্থায় ফিরে গেলাম। এখন অবশ্য উষ্ণতার মুহূর্তে স্মৃতি থেকে টেনে এনে বিভিন্ন গল্প বলতাম, যাতে ইরাজের বিশেষ ভূমিকা থাকত। সে গল্প তাকে তৃপ্তি দিত, তবে দেহটাকে প্রবীণ জ্ঞানীর মতো নিস্তেজ ক'রে রাখত। তবে মনোমালিন্যের ঝামেলা তেমন ছিল না ব'লে যান্ত্রিক উপায়ে শয্যা-যাপন সম্পন্ন হতো এবং উভয়ে এক জাতীয় নির্বিকার পারিবারিক সন্তুষ্টি লাভ করতাম। এর মধ্যেই আমরা একটা সন্তান নিয়ে ফেললাম। ছেলে। পরের বছর আরও একটা। এবারও ছেলে। রূপা বলল, “আরো একটা।” আমি তাকে অনুরোধ ক'রে থামিয়ে রাখলাম। মাতৃত্বের টান মেয়েদেরকে বর্তমানমুখী ক'রে তোলে। থামিয়ে রাখলাম। হয়তো রূপা

নিজেকে অতীতের মায়া এবং বর্তমানের শূন্যতা থেকে বাঁচাবার জন্য তাই চেয়েছিল। কিন্তু পিতৃত্বের দায়িত্ববোধই আমাকে কম সন্তানের পিতা হতে বাধ্য করেছিল। বড় ছেলেটাকে মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে আমরা আপাতত ছোটটাকে নিয়ে থাকতাম।

যন্ত্রের মতো কেটে গেল আরো পাঁচ বছর।

আমার সৌন্দর্যবোধ এবং আধ্যাত্মিকতা-প্রীতি আমার যৌবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং রূপার মাতৃত্ব এবং সংসার তার যৌবনকে মেরে ফেলেছে। ফলে বড় একা মনে হতো নিজেকে। শুরু করলাম ভিন্ন কৌশল। তাকে বৈষ্ণবতত্ত্ব সূফীতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী ক'রে তোলার চেষ্টা করলাম। উদ্দেশ্য যৌবনকে অস্বীকার করানো নয়, তাকে সংসারের প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে উদাসীন করিয়ে তার মধ্যে জৈবিক এবং মানসিক প্রবৃত্তিগুলোকে স্বাভাবিক ক'রে তোলে। আমার ধারণা ছিল, প্রবৃত্তি যখন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং *প্রকৃতিক* উপায়ে প্রকাশ পাবার সুযোগ পায়, তখন তা তার প্রকৃত শক্তি অর্জন করে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। মাতৃত্ব নারীর জন্য সক্রিয় আধ্যাত্মিকতার অন্তরায়। মাতৃত্ব দাঁড়িয়ে আছে এক জাতীয় তৃপ্তির শীতল ভিতের ওপর। সে তৃপ্তি আত্মার প্রগতিকে থামিয়ে দেয়। মেয়েরা যখন মা হয়, তখন তাদের অতীত আর বর্তমানের মধ্যে একটা স্থায়ী বেড়া তৈরি হয়ে যায়। এ কারণে কোনো নারীই কোনো কিশোরীর মতো নয়, কোনো কিশোরীও মাতৃত্বপ্রাপ্ত কোনো নারীকে তেমন পছন্দ করে না। এমনকি এই কারণেই স্বয়ং মা-ই তার কিশোরী কন্যার মনটাকে ঠিক মতো বুঝতে পারে না। মেয়েদের মধ্যে নারীত্বের উপাদান কতখানি আছে এবং তা কিভাবে বিবর্তিত হয় তা জানার জন্য, আমার মতে, তাদেরকে কোনো কিশোরীর সাথে তুলনা করাই যথেষ্ট।

আমার মনে হতে লাগল আমি বঞ্চিত। তবে তার দোষ রূপার ঘাড়ে চাপানোর মতো সংকীর্ণতা আমার কোনো কালে ছিল না। তবুও সে বঞ্চনার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমাকে রূপার সাহায্য নিতে হবে। এই বয়সে আমি পরকীয়া নদীতে সাঁতার কাটতে যাব নাকি?

অনেক চিন্তা ক'রে কোনো সমাধান পেলাম না। সমস্যার অস্তিত্ব যখন প্রধানত চিন্তাতে, রূপাকে তার জন্য প্রতিশোধ নেয়ার আরো সুযোগ দেয়া যেতে পারে, তাতে সুপ্ত রূপা তার শীতনিদ্রার গুহা থেকে বের হয়ে আসতেও পারে। শুরু করলাম নোতুন কৌশল। উড়ো ফোন।

আমি অফিস থেকে রূপাকে এক দিন ফোন করলাম, গলাটাকে সামান্য বিকৃত ক'রে। তাছাড়া একটা আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বিয়ের পরবর্তী প্রথম কয়েকদিন ছাড়া আমরা পরস্পরের সাথে ফোনে আলাপ করিনি বললেই চলে। ফলে আমার তারবাহিত কণ্ঠস্বর চেনা রূপার জন্য ছিল খুব কষ্টকর।

"হ্যালো। আপনি মিসেস রূপা?"

"জ্বী। আপনি কে বলছেন?"

"আমার নাম শুনে আপনি আমাকে চিনবেন না। তবে পরিচয় দিলে বুঝতে পারবেন। আমার নাম ইরাজ।"

ওপাশে একটা আকস্মিকভাবে ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস। নিরবতা।

"হ্যালো, আপনার সাথে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আপনাকে আমি কখনও দেখিনি, যদিও আপনার স্বামীকে আমি চিনি। খুব ভালো মানুষ উনি। অবশ্য ওনার সাথে কখনও আলাপ হয়নি আমার। আপনার কথা শুনেছিলাম পনর বছর আগে আমার এক বন্ধুর কাছে। ওরও নাম ছিল ইরাজ।"

ওপাশে টেলিফোন রেখে দেয়ার শব্দ হলো। বুঝতে পারলাম অ্যাপ্রোচে ভুল হয়ে গেছে। পরের দিন আবার ট্রাই করতে হবে।

পরদিন আবারও হলো।

"কে বলছেন?"

"ভাবী, আমি ইরাজ। তিন দিনের মধ্যেই লন্ডনে ফিরে যেতে হবে। তাই ভাবলাম সংবাদটা আপনাকে দিয়ে যাই, যদিও পনরটা বছর কেটে গেছে।"

কথাগুলো খুব দ্রুত ব'লে ফেলে একটু থামলাম, রিসিভার রেখে দেয়ার শব্দ শোনা যায় কি না।

কিন্তু না। সাড়া এল, "পনর বছর আগের সংবাদ?"

“জ্বী।”

সামান্য নিরবতা। হয়তো ওপাশে রূপা এখন রিসিভারটাকে হাতে নিয়ে পনর বছর আগের অতীতে ফিরে গেছে। প্রয়োজন হলে জুরাসিক যুগের ডাইনোসরদের চারণভূমিতে পৌঁছে যেতেও তার আপত্তি নেই।

“কী সংবাদ, ভাই। কাইন্ডলি একটু সংক্ষেপে বললে ভালো হতো। উনুনে তরকারি চড়ানো তো।”

আমি জানি উনুনের পাশে বুয়ারা আছে এবং তরকারি তারাই পাকায়।

“আমি ছিলাম ইরাজের ভার্সিটির বন্ধু। একই ইয়ারে ইরাজ ইংলিশে আর আমি ফিজিক্সে ভর্তি হয়েছিলাম। নামে এবং এমনকি স্বভাবেও প্রচণ্ড মিল থাকায় আমরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলাম। বন্ধুত্বের সূত্রপাত হল থেকে।”

এভাবে কাহিনী ফাঁদতে লাগলাম। লক্ষ্য এটা দেখানো যে ইরাজ আর আমার মধ্যে ওঠা-বসায়, খাওয়া-পরায়, খেলা-ধুলায়, পড়ালেখায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে এত মিল ছিল যে সে আর আমি মূলত একই। পার্থক্য এটাই যে সে প্রেম ক'রে মরেছে আর আমি প্রেম না করতে পেরে বেঁচে আছি। তাকে জানালাম যে ইরাজ আর তার মধ্যে যা-কিছু ঘটেছিল তার সবই সে আমাকে বলত। তার প্রেমে ইরাজ কতটা বুঁদ হয়ে থাকত, কিভাবে পড়ালেখায় অবহেলা করত, তার সব আমি তাকে বললাম। আমার ব্যাপারে তাকে জানালাম যে, আমিও একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম। কিন্তু সে আমাকে কখনও তেমন আমল দেয়নি। ফলে আজও বিয়ে করিনি। স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডন চ'লে গিয়েছিলাম। সেখানেই একটা কলেজে শিক্ষকতা করি। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার লন্ডনে চ'লে গিয়েছিলাম। সেখানেই একটা কলেজে শিক্ষকতা করি। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার দেশে এসেছি। কিন্তু তার সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ করতে পারিনি। এরাজের মৃত্যু-সংবাদটা ঢাকা থেকেই শুনে গিয়েছিলাম। “সে এক করুণ কাহিনী ভাবী। আপনি সত্যিই সুখী যে সেই রহস্যজনক সত্যকে জানার বিড়ম্বনা আপনাকে পোহাতে হয়নি।”

“আপনি কি কষ্ট ক’রে আসল ঘটনাটা আমাকে বলবেন? অবশ্য সে যে আত্মহত্যা করেছিল তা জানি। অনেক পরে শুনেছি। আমার স্বামীই আমাকে বলেছে। কিন্তু কেন করেছিল তার কারণ জানতে পারিনি।”

“সে আত্মহত্যা করেছিল চিরকাল আপনার মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য। শেষ পর্যায়ে এক দিন আমার রুমে এসে বিছানায় নেতিয়ে পড়ল। হা-হুতাশ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ ক’রে খুশি হয়ে উঠল। বলল, চিহ্ন রেকে দিয়েছি, দোস। দেখিস, তা জীবনেও যাবে না। তারপর ইরাজ আমাকে বলল চিহ্নের রহস্য। আপনার নাভীর পাশের পোড়া দাগটার কথা। তা সে ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছিল। কারণ, এখন বুঝি, তার আগেই সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। এ কারণে আপনাকে সামান্য কষ্ট দিয়ে সে যে কষ্ট পেয়েছিল, আনন্দ পেয়েছিল তারও বেশি। বলেছিল, দোস, আমি জিতেছি। তার চোখে-মুখে আনন্দ আর ধরে না। অবশ্য আমার জানার কথা নয় সে এখনও জিতে আছে কি না। তার চিহ্নটার অকাল-সমাধি হয়েছে কি না তা আমার জানার কথা নয়।”

ওপাশে শুনতে পেলাম একটা স্বাগত দীর্ঘশ্বাস। যন্ত্রের মতো আত্মমগ্ন মৃদু উচ্চারণ, “ইচ্ছাকৃত!”

আমি বলতে লাগলাম, “কিন্তু ভাবী, ওর মৃত্যুর ঘটনাটা আরো রহস্যময়। আত্মহত্যার আগে সে আমার কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল। আজও তা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। অবশ্য আপনি এখন রান্নাঘরের কাজগুলো সারুন। বাকিটা পরে শুনতে পারব। আরো তিন দিন তো আছি। অবশ্য আপনি চাইলে রাতে ডায়াল করতে পারি।”

“ও প্লীজ্, তা করবেন না। বরং পরদিন দুপুরে করুন।”

পরদিন দুপুরে প্রথমেই রূপা আমাকে ধন্যবাদ জানাল, “আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অবশ্য আমি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি।”

“কখ্খনও তা মনে করবেন না। বরং আমিই আপনার সময় নষ্ট করছি এবং মিছেমিছি আপনাকে বিরক্ত করছি। স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে কেই বা কষ্ট পেতে ভালোবাসে।”

“কষ্টই তো পেলাম না। তার আগেই তা স্মৃতিতে পরিণত হয়ে গেল।”

“কথাগুলো আপনাকে বলা আমার একটা গুরুদায়িত্ব—তার তরফ থেকে এবং এমনকি নিজের তরফ থেকে। ওকে যে কত ভালবাসতাম তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। অবশ্য তাকে ভালোবাসার অধিকার আমার চেয়ে আপনারই বেশি।”

“ঠিক বলেননি। ভালোবাসাই তার অধিকারকে তৈরি ক’রে নেয়।”

লক্ষ্য করলাম যে রূপা এখনও পর্যন্ত আমাকে ‘ইরাজ’ বা ‘ইরাজ ভাই’ এরূপ কোনো কথা ব’লে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করল না।

“তাহলে তার মৃত্যুর ঘটনাটা বলি। সে আপনাকে ভালোবাসতে ব’লে আপনাকে বিয়ে করতে চায়নি। বলত—এত আদরের এবং ভালোবাসার ধনকে অভাব-অনটনের মধ্যে রাখতে আমি পারব না। মধুসূদন যেমন বঙ্গভূমি ছেড়ে যাওয়ার সময়ে বলেছিলেন, হে মাতঃ বঙ্গভূমি/তোমারে ছাড়িনু আমি তোমারি কারণে, তেমনি আমিও রূপাকে চিরকাল ভালোবাসতে চাই ব’লে তাকে বিয়ে করতে চাই না। ইরাজের ভালোবাসায় তারুণ্যের আবেগটা বেশি ছিল সত্য, তবে তা ছিল নিখাঁদ ভালোবাসা। সে বলেছিল, দোস, আমি যদি কোনো কারণে না থাকি, তাহলে সেই কথাগুলো রূপাকে বলিস যা আমি কখনও তাকে বলতে পারিনি। আমি জানতাম না কথাগুলো কী। তাছাড়া আপনার সাথে তো তার সব প্রেমালাপই হতো; তাহলে এমন কী কথা থাকতে পারে যা সে আপনাকে বলেনি অথচ যা সে বলতে চায়? তার সে উদ্দেশ্য আমি আগে বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু আপনার বিয়ের ঠিক এক দিন আগে সে আত্মহত্যা ক’রে এবং আমার উদ্দেশ্য শেষ চিঠি পাঠিয়ে সে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল কথাটা কী। চিঠিটা আমাদের সাথেই আছে। আপনি দেকলে সেই পনর বছরের আগের জীবন্ত হাতের লেখা স্পষ্টভাবে চিনতে পারতেন। অবশ্য আমি আপনার বাসার ঠিকানা জানি না।”

“না, না, তার দরকার নেই। আচ্ছা, আপনি এখন কোত্থেকে বথা বলছেন?”

“আমার এক বোনের বাসা থেকে। মগবাজারে। যাহোক, চিঠির একটা রহস্যের কথা বলি। সে চিঠিতে প্রমাণ রেখে গেছে যে সে-ই মৃত্যুর আগে আপনার বিয়ে ঠিক ক’রে গিয়েছিল। ওটাও ছিল তার আরেকটা কৌশল। সে এক নাগাড়ে প্রায়

এক মাস দৌড়াদৌড়ি ক'রে একজন ঘটক পাঠিয়েছিল আপনার বাবার কাছে। ঘটক গিয়েছিল অন্য একটা ছেলের পক্ষ হয়ে। এদিকে আপনার বাবা তখন আপনাকে বিয়ে দেয়ার জন্য ব্যাকুল। মহল্লায়, ইরাজ আর আপনার ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় তিনি আপনাদেরকে নিয়ে চ'লে গেলেন তাঁর গুলশানের বাড়িতে। কী ভাবী, ঠিক বলিনি?"

"হ্যাঁ। একেবারে মিলে যাচ্ছে।"

"তখনই ঘটক আপনার বাবার কাছে গেল। কিন্তু ইরাজের আরেক জন বন্ধু ছিল, যে তারই ব্যাচে তার সাথে পড়ত। তাকেও সে আপনাদের সম্পর্কের কথা কিছু কিছু খুলে বলেছিল, দাগটার কথা বাদে। সেও ছিল একজন ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলে। সে ইরাজের মুখে আপনার রূপ-গুণের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে ইরাজের ঘটককে ভয় দেখিয়ে এবং টাকা দিয়ে কিনে তার নিজের কাজে ব্যবহার করেছিল। সে-ই সার্থক হয়েছিল। আপনি এখন তার ঘরই করছেন।"

ওপাশে এক রহস্যময় দীর্ঘশ্বাস সারা ঘরে হাহাকার ছড়িয়ে দিল। একজন গোঁড়া বাস্তববাদীও তার অতীতকে রূপকথার মতো ক'রে বিবেচনা করতে ভালোবাসে। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রবণতাটা আরো বেশি। আর তা যদি হয় এমন অতীত যা সে নিজেই এতদিন জানত না, এবং জানার পর দ্যাখে যে তা আসলেই রূপকথা, তাহলে সে তার জীবন আর স্বপ্নের মধ্যে কোনো পার্থক্যকারী সীমারেখা টানতে পারবে না। টের পেলাম, রূপা রিসিভার ধ'রে সরাসরি স্বপ্নের মধ্যে চ'লে গেছে। সে এখন আর একজন মা নয়, সে এখন একজন যুবতী যার যন্ত্রণা একজন ষোড়শীর মতো এবং স্বপ্ন একটা প্রগল্‌ভ তরুণীর মতো। সেখান থেকে তাকে আর কোনো দিন বর্তমানে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তাহেল নির্ঘাৎ মৃত্যু ঘটবে। সুতরাং এই মিথ্যাকে আমাকে চিরকাল সত্যের মর্যাদা দিতে হবে। মর্যাদার অভাবে সত্যও মিথ্যা হয়ে যায়। এখন থেকে মর্যাদার গুণেই একটা ডাহা মিথ্যা একটা নারীর আপন ভুবনের সবচেয়ে সত্য ঘটনা হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। শুধু সে কেন, তার মধ্যে আমাকেও একটু একটু ক'রে ঢুকে পড়তে হবে। আমি এখন একই সাথে ইরাজ, ইরাজের বন্ধু—যা আমি আগেও ছিলাম, এবং কল্পিত ঘটনার ভিলেন। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভিলেনটা। তাকে অবলম্বন ক'রেই আমি সময়কে হার মানিয়ে এক বিস্ময়কর যাদুকরী কায়দায় পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর এক বহুমাত্রিক রমণকে পেতে

যাচ্ছি। তার জন্য আমাকে মিথ্যাকে সত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখার দায়িত্বটুকু পালন করতে হবে শুধু। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য শুধু এটুকু যে, সত্য অন্ধকারে গেলে মিথ্যা হয়ে যায় আর, মিথ্যাকে সত্য হিসেবে টিকিয়ে রাখতে হলে তাকে আলোতে আনা যায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে যে জীবনের প্রকৃত ছবি ফুটে ওঠে অন্ধকারেই। তাতে সত্য আর মিথ্যা সবই জীবনের জন্য সমান উপাদেয়—কোনো আইনী করাত তাদেরকে জীবনের আলিঙ্গন থেকে আলাদা করে না। জীবনের উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতাই তার নিজস্ব সত্য-মিথ্যাকে রচনা করে। এ কারণে, আমার মতে, জীবনকে সংজ্ঞায়িত করাতে যাওয়া ঠিক নয়। গাণিতিক সংজ্ঞার শাসন সত্য এবং মিথ্যাকে ভিন্ন ভিন্ন ফর্মুলায় স্থান নিতে বাধ্য করে। যা জীবনকে জাগিয়ে তোলে, তার ওপর আর আইনী সংজ্ঞা আরোপ ক'রে লাভ কী। আমি ব'লে চললাম—

"মানুষ তার প্রেমিক বা প্রেমিকাকে নিজে বিয়ে করতে না পারলে সে তাকে অন্তত নিজের পছন্দমতো কারো সাথে বিয়ে দিতে চায়। সচরাচর মেয়েরাই এরকম ক'রে থাকে। ইরাজও আপনার বেলায় তাই চেয়েছিল। তার হৃদয়ে ছিল নারীর হৃদয়ের কোমলতা। অবশ্য তার উদ্দেশ্যের কথাও সে আমাকে বলেছিল। সে বলেছিল—রূপাকে আমি এমন এক জনের সাথে বিয়ে করিয়ে দিতে চাই যার ঘরে সে অত্যন্ত সুখে থাকবে এবং তার কাছে আমি তাকে মাঝে-মধ্যে দেখতে পারব। শুধু দূর থেকে দেখব। যার সাথে আপনার বিয়ের ব্যাপারে সে ভাবছিল, সে ছিল সত্যিকারের একজন মুক্ত মনের মানুষ। সে ইরাজের উদ্দেশ্যের কথা শুনেই সাগ্রহে রাজি হয়েছিল। কারণ সে ইরাজকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত। আরো একটা রহস্যজনক ঘটনা হলো এই যে, ইরাজের সেই বন্ধুটার জীবনে আগে কোনোদিন প্রেম আসেনি। আপনাকে না দেখে এবং কেবল ইরাজের মুখে আপনার কথা শুনেই, ইরাজের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর সে আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তবে ব্যর্থ হবার পর সে মানসিকভাবে ভেঙেও পড়েছিল। কিছু দিন পর সেও লেখাপড়ার জন্য বাইরে চ'লে গিয়েছিল। সে ছিল আমারও একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি জানি না এখন সে কী অবস্থায় আছে। তবে খোঁজ নিতে পারি। হয়তো নিতেও হবে। আমার কাছে যে চিঠিটা আছে তা পড়লে তার সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পারতেন। আচ্ছা ভাবী, এখন রাখি। আরও দুদিন তো আছি। আবার আগামীকাল আলাপ করা যাবে। মনটাও তেমন ভালো যাচ্ছে না।"

ওপাশে দীর্ঘশ্বাস এবং ক্ষীণকণ্ঠের উচ্চারণ শোন গেল, "আমার জন্য অনেক কষ্ট করলেন আপনি, ইরাজ ভাই।"

ইরাজ ভাই! এবার রূপা তার সবচেয়ে প্রিয় নামটা উচ্চারণ করেছে। আমি একটা মৃত বর্তমানকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে আরেকটা মুমূর্ষু অতীতকে বাঁচিয়ে তুলতে পেরে গর্ববোধ করলাম।

তার পরের দুই দিন আমি রূপাকে ফোন করিনি। সে ভেবেছে আমি বুঝি লন্ডনে ফিরে গেছি। তাতে সে যে কতটুকু বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল তা বুঝতে পারতাম যতক্ষণ বাসায় থাকতাম ততক্ষণ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর রূপাকে পাওয়া যেত না। অবশ্য এই ক'দিন তার প্রতি আমি আমার আদর আর সহানুভূতির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তার অনিচ্ছা না থাকলেও তার ব্যক্তিগত সান্নিধ্য চাইতাম না।

তৃতীয় দিন দুপুরের পর হঠাৎ তাকে ইরাজ সেজে ফোন করলাম, "যাবার ডেট পিছিয়ে দিতে হলো। পুরনো পারিবারিক কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকার করণে গত দেড় দিন ঢাকায় থাকতে পারিনি। আবার আপনাকে মাঝপথে ঝুলিয়ে রেখেও যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার ইতিহাসকে গোপন করার অধিকার আছে কেবল আপনারই, আমার নয়।"

"আমি আপনাকে অনেক অসুবিধায় ফেলে দিলাম। আসলে আমার খুব আক্ষেপ হচ্ছে। আমি এ উপকারের প্রতিদান দিতে পারব না।"

"কী যে বলেন। আমার বুকটা খালি হচ্ছে এটাই বড় প্রতিদান।"

"আপনি একটা চিঠির কথা বলেছিলেন।"

"হ্যাঁ, ওটাই তো সেই দলিল। তাতেই লেখা আছে ইরাজ তার রূপাকে কার জীবনের সাথে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিল। আপনি বললে চিঠিটা আমি মেইল ক'রে পাঠিয়ে দিতে পারি।"

"না, না, তার দরকার নেই। আচ্ছা, আপনার বোনের বাসার ঠিকানাটা একটু জানতে পারি?"

"অবশ্যই। আপনি আসতে চাইবেন এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তার স্বার্থে আপনাকে একটা কথা আমার বলা কর্তব্য। তা হলো, আমার বোনের বাসায় আপনাদের ঘটনাটা সবাই জানে।"

"ও মা! কী বলছেন!"

"হ্যাঁ। পৃথিবীতে ঘটনাটা জানে শুধু এরাই। ব্যাপারটাকে আমি আমার জানা যাবতীয় ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তাই বুকটা খালি করার প্রয়োজনে আমার বোনকে তা বলেছি। সত্য বলতে কী, আমার বোন ঘটনাটা জানে সেই প্রথম থেকেই।"

"হায় কপাল! এখন কী করা। আমি আপনার বোনের সামনে যেতে পারব না। বিশেষ ক'রে, আমি তার সামনে দিয়ে আপনার সাথে দেখা করতে যেতে পারব না।"

"সে আপনার ইচ্ছা। তবে আমার মনে হয় তাতে কোনো সমস্যা হতো না। অবশ্য ভাগ্নে-ভাগ্নীরাও জানে।"

"ও মাই গড!"

"তাহলে বরং আমরা কোনো রেস্টুরেন্টে দেখা করি। আপনাকেও একবার দেখতে পারব। অবশ্য একটা আফসোস রয়ে যাবে। আপনার বর্তমানের রূপ দেখে অতীতের রূপাকে অনুমান করতে পারব না।"

সে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "আফসোসের কষ্ট পেতে হবে না। বোরখা প'রে আসব।"

মনে মনে বললাম, তুমি কী প'রে আস সেটা বড় কথা নয়, আমি ভাবছি আমি কী পরব। তুমি বর্ম পরে এলেও আমি জানতে পারব তার মধ্যে কোন রূপা লুকিয়ে আছে। কিন্তু সমস্যা যত আমাকে নিয়ে। আমাকে এখন কোনো এক ইরাজের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে হবে। বললাম, "ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনাকে অনুরোধ ক'রে বিব্রত করব না। তবে একটা উপায় হতে পারে, আগামীকাল এরা সবাই মিলে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে। বুয়ারাও থাকবে না। আমি খাওয়া-দাওয়া সারব হোটেলে।

এখানে একাই থাকব। আপন মনে করলে আসতে পারেন। অবশ্য আপনার আপত্তি থাকলে....”

“কখন?”

“আমি অবশ্য বিকালে একটু বের হয়ে পড়ব। কয়েক জন পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করতে হবে।”

“তাহলে দুপুরে?”

তথাস্তু। তাকে ঠিকানা দিলাম। ঘটনার সম্ভাব্যতা অনুমান ক'রে আগে থেকে বাসা ভাড়া ক'রে সব ঠিক-ঠাক করে রাখার ঝুঁকি নিয়েছিলাম। আমারই এক পুরনো এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়ির একটা বড় ফ্ল্যাট। তাকে সব কিছু খুলে বলেছিলাম। এরূপ ঘটনায় সাহায্য করতে পেরে সে নিজেকে শুধু ধন্যই মনে করেনি, সে ভেবেছিল যে সে পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় এক বাস্তব সিনেমার শুটিঙের প্রযোজক হতে পেরেছে। আসলেও ছবি প্রযোজনা ছিল তার কয়েকটা ব্যবসার মধ্যে একটি। আমার ক্লিন-শেভের মুখে তকতকে একটা গোঁফ এবং চুলের মেক-আপের দায়িত্ব সে-ই নিয়েছিল।

সেই রাতে রূপা আমার সাথে তথাকথিত “আদর্শ রমণীর এবং গৃহিণীর” মতো ব্যবহার করেছিল। আমি বাসায় গেলে সে আমার পোশাক ছাড়ার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে, খাবার সময়ে আমার পাশে ব'সে থেকেছে—অথচ আগে খুব কমই সে আমার সাথে ব'সে খেয়েছে বা খাবার সময়ে আমার পাশে ব'সে দুটো কথা বলেছে। মেয়েরা যখন স্বেচ্ছায় কোনো গোপন অপরাধ করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়, তখন যার বিরুদ্ধে তা সংঘটিত হবে তাকে মাত্রাতিরিক্ত মধুর ব্যবহার দিয়ে তারা তার এক জাতীয় ক্ষতিপূরণ দেয়। আমি নিজেকে সংসারের মধ্যে রাজার হালে খুঁজে পেলাম। ভাবতেই পুলক লাগছিল যে আমি এখন পরিপূর্ণভাবে আনন্দিত—ঘরে এবং বাইরে। এবং রূপাও তাই হবে। সে এখন অভিসারে তার অতীতকে পাবে, বর্তমানকে পাবে সেই অতীতের সংরক্ষণের প্রয়োজনে। এ কি বিস্ময়কর সমীকরণ! অসংখ্য আপাত-বিরোধী মাত্রা তাতে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মিশে গেছে। মিথ্যার মধ্যে সত্য লুকিয়ে আছে, সত্যকে ঘাটলেও তাকে আর কঠোর মনে হচ্ছে না, যেহেতু তা থেকে পাওয়া যাচ্ছে মিথ্যার স্বাদ। অনস্তিত্বের মধ্যে পাওয়া গেছে অস্তিত্ব, অস্তিত্ব পেয়েছে স্বপ্নিল নোতুনত্ব। স্বপ্ন চ'লে এসেছে বাস্তবে, বাস্তব হয়েছে স্বপ্নময়। বলা হয়ে থাকে

যে স্বপ্নকে সফল করার একমাত্র উপায় হলো স্বপ্ন শেষে জেগে ওঠা। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে জাগরণ এবং সফলতাকে মধুর ক'রে তুলতে হলে তাকে ঢেকে দিতে হবে স্বপ্নের রহস্যময় আস্তরণ দিয়ে। স্বপ্ন জীবনকে মধুর করার জন্য, জীবন স্বপ্ন দেখার জন্য। একটা বাস্তব স্বপ্নরাজ্য নির্মাণ করতে পারাই স্বপ্নের প্রকৃত সফলতা। স্বপ্ন শেষে জেগে উঠে যদি দেখা যায় যে এক চমৎকার সফলতার স্বপ্নের মধ্যে জেগে আছি, তাহলে বলতে পারি যে স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমি স্বপ্নকে প্রশ্নের সম্মুখীন করতে চাই না, আমি প্রশ্ন করতে চাই জাগরণকে। জাগরণ যদি স্বপ্নময় না হয় তাহলে সে জেগে ওঠার কোনো মানে হয় না।

সব অভিসারের শ্রেষ্ঠ হলো অতীতের সাথে অভিসার করা। এমন কে আছে অতীত স্মৃতি যাকে বলাৎকার করেনি?

কিন্তু রূপা তো যাচ্ছে অতীত ভ্রমণে। আমি যাচ্ছি কোথায়? আমি কি তাহলে আমার বর্তমানকেও অতীতের ভাঁগাড়ে নিক্ষেপ করছি? তবুও যা হবার হোক। বর্তমানে যদি কখনও ফিরে আসতে হয়, তাহলে একটা বর্ণময় অতীত পাব। বর্তমানটা বড্ড বেয়াড়া। তাই মানুষ হয় অতীতে না হয় ভবিষ্যতে বেঁচে থাকতে চায়। আমি কেন তাহলে বিবেককে উস্কে দিচ্ছি? আমার ভবিষ্যতের মধ্যেই একটা অনন্য অতীত থাকবে।

১৬

পরদিন আমার দ্বিতীয় সংস্করণের ইরাজ সেজে বেগানা পোশাকে সজ্জিত হয়ে ডিম লাইটের রোমান্টিক সাসপেন্সের মধ্যে সাজানো ঘরে ব'সে আছি। একটু পরে আমার কাছে যে আসবে তার বুকটা নিশ্চয়ই এখন থেকেই ছম ছম করছে। আমারও। আমি আমার স্নায়ুতন্ত্রের আদিম কোঠরে অন্য কোনো এক আমি'র আগমনের গন্ধ পাচ্ছি। যেন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগের উৎসুক গুহামানব আমার সত্তার একাংশ জুড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ব'সে আছে। আমার অপেক্ষা আমাকে তিলে তিলে এক আধিভৌতিক ইরাজ বানিয়ে দিচ্ছে। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা উলম্ব বৈদ্যুতিক ধাক্কা শির শির ক'রে মাথার দিকে উঠে গেল। আয়নার মধ্যে তাকিয়েও আমি এখন আমাকে চিনতে পারব না।

এক জোড়া বড় সানগ্লাস একটা সাহেবি টুপি প'রে নিলাম। সিগারেট ধরালাম। কোনো দিন ধূমপানের অভ্যাস ছিল না।

কিছুক্ষণ পর কলিং বেল বেজে উঠল।

বুকের ভেতরটা ন'ড়ে উঠল আমার।

"প্লিজ আসুন। দরোজা খোলাই আছে।"

রূপা ভেতরে ঢুকেই ইতস্তত করতে লাগল। সে অন্ধকার ঘরে পা দিয়েছে। "দুঃখিত, ঘরটাকে অন্ধকার ক'রে রাখা একটা চরম অভদ্রতা। আপনি তো নিজেকে বাঁচাবার জন্য বোরখা প'রে এসেছেন। আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্য এর চেয়ে অন্য আর কী-ইবা করতে পারতাম? এখন বুঝতেই পারছেন আমাকে আপনার কেন ক্ষমা ক'রে দেয়া উচিত, নয় কি? আমি শুধু আপনার ইতিহাসের একজন সাক্ষী। সুতরাং আপনাকে না দেখলেও আমার চলবে।"

সে বসল। চারদিকে সন্দেহপূর্ণ অথচ উৎসুক দৃষ্টিতে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিল। আমাকে দেখল কয়েক বার। তার সামনের ছোট টেবিলটায় ছোট একটা টেবিল-ল্যাম্প সাজানোই ছিল। তার কাছে ইরাজের শেষ চিঠিটা দিয়ে আমি তাকে পড়তে ব'লে দূরবর্তী একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম। লাইটটা জ্বালিয়ে চিঠিটা খুলতেই সে চমকে উঠল। প্রথমে পুরা চিঠির অবয়বটা একবার দেখে নিল এবং তারপর তা পড়তে শুরু করল। কোন বাক্যটা প'ড়ে রূপা অনুভূতির কোন পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে অদূরে ব'সে তা আমি অনুমান করতে লাগলাম। চিঠিটা একবার প'ড়ে সে কিছুক্ষণ হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে ব'সে থাকল। মনে হলো সে কাঁদতে চায়। বিয়োগ-ব্যথার কান্নার সময়ে সহানুভূতির সাহায্য পেলে কাঁদতে সুবিধা হয়। ভাবলাম পাশে গিয়ে দুয়েকটা প্রবোধ বাক্য শুনিয়ে কিংবা ঘাড়ে হাত দিয়ে তাঁকে কাঁদতে সাহায্য করি। কিন্তু তার আগে কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। তাই জায়গায় ব'সে থেকেই গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলাম, "চিঠিটা যাকে দেয়া হয়েছিল, তার সাথেই ইরাজের প্রিয় রূপার বিয়ের কথা হচ্ছিল। রূপার বাবাও রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। পরের ঘটনা তো আপনাকে বলেছি। আপনি এই পনের বছর ধ'রেই সেই ঘটনারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করছেন। আপনাকে এও বলেছি যে সেও পরবর্তীতে রূপাকে ভালোবেসেছিল। এখনও বাসে।"

“এখনও বাসে?”

“ হ্যাঁ। সে এখনও বিয়ে করিনি। তার নামও ছিল ইরাজ।”

রূপা চকিত হরিণীর মতো আমার দিকে তাকাল। তার চোখ অশ্রু-প্লাবিত।

ধীরে ধীরে রূপার কাছের সোফায় গিয়ে বসলাম। রূপা এখন সত্যিকারের রূপা হয়ে গেছে। আমি ছদ্মবেশ খুলে ফেললেও সে আমাকে এই অন্ধকার ঘরে চিনতে পারবে না।

আবি টেবিল লাইটটা নিভিয়ে দিলাম। রূপা চমকে উঠল। চমকে উঠলে, মেয়েরা আবার নিজের মতো হয়ে যায়। আমি দূরত্ব বজায় রেখেই বললাম, “আপনাকে কখনও দেখিনি। নাই বা দেখলাম আলোতে। আলোয় দূরত্ব বাড়ে।” একটু থেমে, “যতদূর জানি, ইরাজের শেষ স্মৃতিচিহ্ন ছিল দুটো—একটা হলো এই চিঠি এবং আরেকটা আপনি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, অর্থাৎ নাভির পাশের সেই দাগটা।”

রূপা চমকে উঠল।

“অবশ্য আমি জানি না তা এখনও আছে কি না।”

রূপা অধোবদনে আমার কথা শুনছে। নোতুন সান্নিধ্যের উষ্ণতা মেয়েরা চোখ নিচু ক’রে গ্রহণ করতে পছন্দ করে।

তার দীর্ঘশ্বাস।

আমারও।

রূপা এখন প্রেমের তথাকথিত ত্রিভুজের বাইরে। এক ইরাজ থাকলে ত্রিভুজ হতো। এখন ইরাজ দুটো। সে এখন প্রেমের চতুর্ভুজ বাস্তবতায় বিচরণ করছে। প্রেম যখন একই সময়ে একাধিক লক্ষ্যের দিকে ছুটে যায়, তখন তা প্রেম থাকে না, কামনায় পর্যবসিত হতে থাকে। পশ্চিমা দেশগুলোতে তারা কামনাকেই প্রেম বলে। কিন্তু কামনা ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং কামনার মধ্যে প্রেমকে ধ’রে রাখার জন্য বললাম, “ধরে নেয়া যায় যে আমরা দুজন এখন অতীতে আছি।”

রূপা তাকিয়ে পড়ল।

আমি তার কোলের কোলের ওপর রাখা সাদা ধবধবে হাতটার ওপর হাত রাখলাম।

শিউরে উঠল সে।

টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা নিয়ে তার হাতে পুরে দিলাম। "এই চিহ্নটাও তোমার কাছে রাখ, রূপা। ওতে লেখা আছে, 'দোস, রূপাকে ভালোবাসিস'। কিন্তু সে অধিকার আমার নেই। চিঠিটা সে যখন লিখেছিল, তখনও জানে না যে তোমার সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে না। যাহোক, ওটা না থাকলেও আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারব। দুটো চিহ্নই তোমার কাছে থাক।"

"কিন্তু ওটাতো আপনার জন্য", ক্ষীণ গলায় বলল সে।

"তাহলে তো রূপাও আমার হয়ে যায়।"

সে চুপ ক'রে রইল। বললাম, "তাহলে কি চিঠিটা আমিই রেখে দেব?"

উত্তর নেই।

আমার মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। "তুমিও আমার হয়ে থাক। তবে আলোতে নয়। শুধু অন্ধকারে।" এই ব'লে আমি তার হাতটা তুলে নিয়ে তাতে একটা চুমু খেলাম।

নিঃশ্বাস ছিড়ে যাওয়ার শব্দ হলো।

তার হাতটা ধ'রে থেকেই আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। আলতো ক'রে তাকে বাহুর মধ্যে গেঁথে নিলাম। সে প্রতিবাদ করল না। তার পিঠে-ঘাড়ে-বাহুতে আদর বুলিয়ে দিলাম। সে প্রগাঢ় অনুরাগে তার অতীতকে ছুঁয়ে আছে, ঐতিহাসিক দেয়ালকে যেমন সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে থাকে মজলুম পোস্টার।

আমি ঢেউ হয়ে তার রক্তের উষ্ণতায় মিশে যেতে লাগলাম। হঠাৎ বিদ্যুৎ চ'লে গেল। মাথার ওপরের ফ্যানটা আর নেই। ডিম লাইটের ক্ষীণ আলোটুকুও এখন আর নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার অর্ধসমাপ্ত অতীতের নাটকটাকে মঞ্চায়িত করার এখনই

প্রকৃত সময়। আমর স্বভাব নৈশ চরিত্র পেতে থাকল। এক পর্যায়ে রূপা বলল, “প্লিজ, আর নয়। এখানেই থেমে যাওয়া ভালো।”

“আমরা এখন সব ভালো-মন্দের অতীতে অবস্থান করছি,” আচরণ পরিবর্তন না ক’রেই জবাব দিলাম।

“কিন্তু আবারও তো বর্তমানে ফিরে যেতে হবে।”

“আবার এখানে ফিরে আসার জন্য।”

“এখন যে তা আর হবার নয়।”

“যখন হবার তখনই তো হয়নি।”

“তবুও তো এটা অসময়। ত্রিশ পার হয়েছি।”

“তবুও তো ষোলে এসে বারবার পিছুটান দিচ্ছে।”

“দুই ছেলের মা হয়ে গেছি।”

“নারী মা হয় মানবজাতির প্রয়োজনে। কোনো বিশেষ মুহূর্তের বা জীবনবোধের মাহাত্মকে সফল করার জন্য নয়।”

“অনেক দায়িত্ব রয়েছে।”

“তোমার নিজের ওপরও তোমার দায়িত্ব আছে।”

“ক্ষমা চাচ্ছি।”

“আমিও।”

“প্লিজ!”

“জীবন আমাকেও ক্ষমা করেনি।”

সে দৌড়ে ভেতরের রুমে চ’লে গেল। আমিও তার পিছু নিলাম। তাকে ক্ষমা করার সম্ভব হলো না।

সেদিন আমি বাসরকে হার মানিয়েছিলাম। রূপা অসংখ্য চোখের পানি দিয়ে আমাকে ক্ষমা করল। চিঠিটা রেখেই বাসায় চ'লে গেল। সে যাবার পর আমি অনেকক্ষণ ধ'রে আলো জ্বালাইনি। অন্তত এই বাসায় এসে আয়নায় মুখ দেখতে চাই না।

১৭

রাতে বাসায় ফিরে রূপাকে একটু বিমর্ষ দেখেছি। কিন্তু তা গোপন করার চেষ্টা করেছে, যা আগে তেমন করত না। রাতে আমি তাকে জ্বালাতন করিনি। তবে সে আমাকে উদারভাবে সান্নিধ্য দিয়েছে। দুই সন্তানের মাতৃত্বের দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করেছে।

পরদিন তাকে ফোন করলাম না।

বাসায় ফিরে রূপাকে চিহ্নিত দেখলাম। তবে সাংসারিক কর্মসূচী চলছিল ঘড়ির কাঁটার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই।

পরদিন আবারও ফোন করলাম। সেই বাসা থেকেই। ওখানে ঢুকলেই আমার এক ভৌতিক রূপান্তর ঘটে। রূপা জবাব দিল, "ইরাজ, অতীতেক তো পেয়েছি। এখন থেমে গেলে ভালো হয় না?"

আমি এখন সত্যি সত্যি ইরাজ। বললাম, "আমার যে কোনো বর্তমান নেই, অতীত ছাড়া।"

নিরবতা।

কয়েক সেকেন্ড পর, "বানিয়ে দেব।"

"চাই না।"

"কেন?"

"অতীত আমাকে অস্বীকার করছে।"

"কিন্তু এভাবে কতদিন?"

“হিসাব করতে চাই না। অতীত ক্ষুদ্র হলেও তার কোনো সীমা নেই।”

“তার চেয়ে আমাকে ম’রে যেতে বল।”

“তুমি আমার বুকের মধ্যেই মরবে। তুমি যার সাথে সংসার করছ সে তোমার জীবনসঙ্গী। আমি তোমার মরণসঙ্গী। আমরা সবাই প্রিয়জনের সাথে বেঁচে থাকতে জানি। ক’জনে তার সাথে মরতে জানি?”

জীবনের মধ্যে মৃত্যুর নেশা অনুভব ক’রে সে কিছুক্ষণ চুপ ক’রে রইল। তারপর, “তোমার বোন এখনও আসেনি?”

“আসবে না।”

“তার মানে?”

“ওরা থাকে ওয়ারীতে। এই বাসায় আমি আমার অতীতকে মঞ্চায়িত করেছি। সব সাজানো। তবে তুমি ছাড়া এ ঘর অন্য কেউ ভাঙতে পারবে না।”

“হায় আল্লা! লন্ডনে যাচ্ছ কবে?”

“কোনো দিন না।”

“তাহলে কি....?”

“ভুল অনুমান ক’রো না। বর্তমানে আর ফিরে যেতে চাই না। অতীতেই থেকে যেতে চাই।”

“কিন্তু অতীতে পুরোপুরি থেকে যাওয়া মানে তো ম’রে থাকা।”

“কবেই বা বেঁচে ছিলাম? মৃত্যুকে বলি, মরণরে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।”

“কিন্তু তোমাকে আমি হাত ধ’রে মারব কী ক’রে?”

“তুমিই আমাকে জীবন দিয়েছ। এত দিন মৃত ছিলাম।”

“আয়ের উৎস?”

“কিছু সঞ্চয় আছে। আমার জন্য যথেষ্ট।”

“সিদ্ধান্তটা পাল্টে ফেরা যায় না?”

“মৃত্যুর সিদ্ধান্ত কেউ পাল্টাতে পারে না। তোমার ভাষায় এটাই তো আমার মৃত্যু।”

“কখন?”

“এখনই।”

এভাবে জীবনের মধ্যে জীবন তৈরি হয়ে গেল। দু’তিন দিন পর আমরা দুজনে মিলে সেখানে স্বপ্ন দেখতে যাই। তবে স্বপ্নকে দুর্লভ এবং মধুর করার জন্য ইরাজ কখনো কখনো উধাও হয়ে যায়, লন্ডনে যায়, গ্রামের বাড়িতে যায়, ফিরে আসে।

কিন্তু সমাধান চিরকাল সমস্যার জন্ম দেয়। কোনো সমাধানই চূড়ান্ত নয়। তা যদি হতো, তাহলে সমাধানের এবং সমাধান নিয়ে চিন্তা করার প্রচেষ্টার কোনো গুরুত্ব থাকত না। জীবনের প্রবাহটাই দ্বান্দ্বিক—তবে, আমার মতে, তা হেগেলীয় অর্থে, মার্কসীয় বস্তুবাচক অর্থে নয়। কিংবা হয়তো উভয় অর্থে। যাহোক, আমার সমাদান তিলে তিলে আমাকেই আমার জন্য এক বড় সমস্যা হিসেবে তৈরি ক’রে ফেলল। আমার চূড়ান্ত প্রশ্ন তৈরি হলো নিজেকে ঘিরে—তাহলে আমি কে?

১৮

আমার সত্তা এখন দুই ভাগে বিভক্ত, যাদেরকে মেলাবার কোনো সূত্র আমার জানা নেই। যৌক্তিকভাবে, আমার ব্যক্তিগত সত্তা ব’লে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে, তা ভিন্ন কিছু না হলেও অন্তত এই দুইয়ের কোনো এক জাতীয় সমন্বয় হবে নিশ্চয়। কিন্তু আমার যুক্তিতে তা অসম্ভব। তাহলে আমি কি আর কখনও নিজেকে ফিরে পাব না?

আমার এই যন্ত্রণার সাথে সাথে বেড়ে উঠতে লাগল আরেকটা যন্ত্রণা—*আমার* রূপা কোথায়? মানুষ নিজেকে খুঁজে না পেলেও সে চায় যে অন্য কেউ তাকে খুঁজে পাক। এভাবে সে অন্যের মধ্যে নিজেকে খুঁজে চায়। এই পাওয়াই মূলত মানবীয় অর্থে নিজেকে পাওয়া। কারণ নিজেকে পাবার অন্য কোনো সহজ উপায় তার জানা নেই। আমি না হয় আমাকে পাইনি, তাই ব’লে আমার কি এমন কোনো রূপাকে

পাবার অধিকার নেই যে আমাকে পাবে? শুধু অনুভূতির দ্বারাই যদি নিজের অস্তিত্বকে প্রতীকী কায়দায় আঁচ ক'রে সন্তুষ্ট থাকতে হলো, তাহলে মানুষকে যুক্তি দেয়া হয়েছিল কেন? একটা যৌক্তিক-আইনি-সামাজিক কাঠামোতে নিজেকে কিছুটা নির্মাণ করতে না পারলে নিজেকে সহজে নিজের বোধগম্যতার স্তরে তুলে আনা যায় না। কিছু কিছু মানুষ আছে—যারা জীবনের একটা অর্থ না খুঁজে পেলে বুঝতে পারে না তারা আদৌ জীবনকে পেয়েছে কি না। আমিও সেই হতভাগাদের মধ্যে একজন। 'জীবনের কী দরাকার ছিল?' এই প্রশ্নের কিছুটা জবাব আছে 'তা দিয়ে কী লাভ হলো?' এই প্রশ্নের জবাবের মধ্যে। তাহলে আমি কি এই প্রশ্নের কোনো জবাবই পাব না?

এই সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কবলে প'ড়ে মাস সাতে আগে ইরাজকে পাঠিয়ে দিলাম লন্ডনে। রূপা অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রগল্‌ভ শিশুর মতো জানতে চেয়েছিল, "কেন চ'লে যাবে?"

"এখানে তো আমি থেকেও নেই।"

"অতীতকে আর ভালবাস না?"

"বাসি ব'লেই যাচ্ছি। অত্যধিক অত্যাচারে অতীত এখন বর্তমান হতে চলেছে। তাকে তো বাঁচিয়ে রাখা চাই।"

"রূপাকে আর ভালোবাস না?"

"বাসি ব'লেই তো তাকে অন্ধকারে রাখতে চাই, আলোতে আনতে চাই না।"

"অন্ধকারেই তো ছিলাম।"

"কিন্তু দিন দিন সে অন্ধকার আলোর মতো উগ্র হয়ে উঠেছে।"

"আবার কবে আসবে?"

"হয়তো আর আসা হবে না।"

"একেবারেই না?"

"সম্ভবত না।"

“অন্তত এক বার?”

“কথা দিতে পারব না।”

“কথা না বা দিলে। শুধু আশ্বাস দাও।”

“লাভ?”

“পথ চেয়ে থাকতে পারব।”

“তাতে আমারই কষ্ট হবে, কারণ অনুমান করতে পারব যে তুমি পথ চেয়ে চেয়ে কষ্ট পাচ্ছ।”

“একটু কষ্ট পাবার অধিকারও আমার নেই?”

বুঝতে পেরেছিলাম, মেয়েরা চায় দূরে ব'সে তাদের জন্য কেউ কষ্ট পাক। রূপার শেষ কথাটার পেছনে এই উদ্দেশ্যটাও কাজ করেছে। বললাম, “আসব।”

“দেরি হবে?”

“বলতে পারব না।”

১৯

ইরাজ চ'লে যাবার পর রূপার দিনগুলো খুব কষ্টে যাচ্ছিল। কিন্তু এবার তার একেবারে ভেঙে পড়ার কথা নয়। প্রেমের প্রধান কিংবা নৈমিত্তিক মাধ্যম যদি হয় যৌনতা, তাহলে প্রেম জীবন থেকে চ'লে গেলেও যৌনতার ওপর নির্ভর ক'রেই তাকে কিছুটা সবল রাখা যায়। জীবনকে সচল রাখার একটা স্বাভাবিক উপায় হলো তাকে কোনো কিছুর ওপর নৈমিত্তিকভাবে নির্ভরশীল ক'রে তোলা। রূপা এই সত্য নিজেই বুঝতে পেরেছে। তাই সে গতকাল আমার জন্য একটা সারপ্রাইজের ব্যবস্থা করেছে। রাতে সে আমাকে পাশের রুমে নিয়ে গেল—রুমটাকে গেস্ট রুম হিসেবে রেখে দিয়েছিলাম। সেটাকে সে সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। সবগুলো লাইট নামিয়ে তাতে রাখা হয়েছে শুধু একটা ডিম লাইট। বললাম, “গেস্ট রুমটাকে এত অন্ধকার ক'রে রেখেছ?”

“এখন থেকে এখানে তুমি আর আমিই হব গেস্ট। অন্য সময়ে ঘরটা তালা দেয়া থাকবে।”

“একসেলেন্ট আইডিয়া।”

“আমি জানতাম তুমি খুশি হবে। এখানে বিছানাটায় বস, তোমাকে একটা উপহার দেই।”

সে আমাকে একটা নকল গোঁফ, একটা সানগ্লাস এবং একটা সাহেবি টুপি উপহার দিল।

“থ্যাংক ইউ!”

“গেস্ট রুমে পরিচয়টা পাল্টে ফেলে গেস্টের মতোই থাকতে হয়।”

“কিন্তু আমি এখন তোমাকে কী উপহার দেই বল তো? আগে বললে কিছু একটা করতে পারতাম....”

“তোমার যা ইচ্ছা পরে দিও। এখন আমি তোমাকে গেস্ট সাজাব।”

সে আমাকে তার ইচ্ছা মতো সাজাল। তারপর “এই বার দাও কী উপহার দেবে” ব’লে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আজ আমি রূপার জন্য উপহার কিনে নিয়ে অনেক রাত ক’রে বাসায় ফিরব—একটা বোরখা। রহস্যময় অন্ধকারে চেনা যাবে না কে কার গেস্ট।

তার পরও কি রূপা ভাববে ইরাজ কবে আসবে?

“কী হে রাজন, তিন কাপ চা সাবাড় ক’রে দিয়েছ?” বিরূদার কথায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পুরনো জগতে ফিরে এলাম। সত্যিই তো, তিন কাপ চা আমার জন্যে অপেক্ষা ক’রে ক’রে কখন যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তা মালুম করতে পারিনি।

পরদিন বিরূদার সাথে দেখা করার কথা ছিল বেলা তিনটায়। বলেছিলেন, "আগামীকাল কোনো রুটিন-বাঁধা কাজ নেই। পারলে তিনটার দিকে চ'লে এস। অনেক গল্প করা যাবে।" আমাকে দেখেই তিনি বললেন, "এস, রাজন, এস, একটু আগের ঘটনা দিয়ে গল্প শুরু করি।"

"একটু আগে আবার কী ঘটালেন?"

"আমি কি আর ঘটালাম? ঘটল। আমি ঘটিয়েছিলাম সপ্তাহ-খানেক আগে।"

"তাহলে চা দিয়ে শুরু হোক।"

"অবশ্যই।—কেরামত, দুই কাপ চা দিয়ে যা। একটা চিনি কম।"

"আপনি চিনি কম খান?"

"এ প্রশ্ন?"

"আমি তো ভেবেছিলাম আপনি চিনিই খান না।"

"কম বলেছি তোমার জন্য।"

"কিন্তু আমি তো চিনি কম খাই না।"

"আমি এত বেশি খাই যে সে অনুসারে তোমার চা বানালে তুমি আর কখনও আমার এখানকার শরবত খেতে চাইবে না।"

"ও আচ্ছা। অদ্ভূত লোক তো আপনি!"

"এবার তাহলে গল্প শুরু করি।"

"ফাইল বের করতে হবে না?"

"আরে না। এসব ছোট-খাট ফানি ঘটনার জন্য আমি ফাইল রাখি না। প্রায় এক সপ্তাহ আগে এক ভদ্রমহিলা এসে অনুনয় করলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমাকে বাঁচান।'

‘তাহলে আগে মরেন।’

‘আহ্, প্লিজ, হেঁয়ালি করবেন না। সত্যি বড় বিপদে আছি।’

তাকে খুব অস্থির দেখাচ্ছিল। মহিলার বয়স পঁয়ত্রিশের উপরে। স্বাস্থ্য শরীর বেশ গাট্টা-গোট্টা। গোলগাল। ফরাট গাল। ভারী বুক। কিন্তু দেহের শেপটা ভালো, বোতলের মতো নয়। রং ফর্সা। ঠোঁট-দুটো অত্যন্ত ভদ্র। চোখ-দুটো কুলিন। দেকলে মনে হয় এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছেন। পোশাক-আশাক মার্জিত। সত্যিকারের সুন্দরী। আর যারা তুলতুলে ফোম পছন্দ করে, তাদের জন্য আদর্শ রমণী। অভিযোগ করলেন, ‘আমার স্বামী খালি অন্য মহিলাদের দিকে তাকায়।’

একটু হেসেও ফেললাম। বললাম, ‘মহা সমস্যা বটে’।’

‘আবারও হেঁয়ালি করছেন? সমস্যাটা আপনার ছোট হলেও আমার জন্য বড়।’

‘কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন?’

‘জ্বী, অনেক আগে। মাঝে মাঝে মনে হতো ওকে বলি যে ওর স্বভাবটা আমার ভালো রাগে না। কিন্তু বলিনি। আসলে আমি ওকে ভালোবাসি। ওর মুডটাও খারাপ ক’রে দিতে চাই না।’

‘এটাই ছিল আপনার পদক্ষেপ?’

‘জ্বী, না। পড়া পানি খাইয়েছিলাম।’

‘পড়া পানি, খট খট ক’রে হেসে উঠলাম আমি।

“জ্বী, কাজ হয়েছিল!”

‘কাজ হয়েছিল!’

‘সত্যি। তবে দিন পনর পর আবার যা তাই।’

‘আহ্, পনর দিন! দীঘ সময় বটে।’

‘কী যা তা বলছেন? পনর দিন কোনো সময় হলো?’

‘যার কাছ থেকে পড়া পানি এনেছিলেন তার ঠিকানাটা জানেন?’

‘জ্বী, এই তো, লিখে নিন।’

‘আমি চটপট ঠিকানাটা লিখে নিয়ে ব্যাগ-পত্র গুছিয়ে বের হতে শুরু করলাম। আমার আচরণ দেখে ভদ্রমহিলা হতভম্ব হয়ে গেল। বলল, ‘কী ব্যাপার? যাচ্ছেন কই, আমাকে কোনো ব্যবস্থা না দিয়ে?’

‘সেই হুজুরের কাছে যাচ্ছি। দেখি অন্তত পনরটা দিন ভালো থাকা যায় কি না।’

এই ব’লে আমি রুম থেকে বেরিয়ে চ’লে গেলাম। মিনিট পাঁচেক পর ফিরে দেখি তিনি নেই।

“বিরূদা, এ আপনি কী শুনালেন,” হাসতে হাসতে বললাম আমি, “নিশ্চয়ই মহিলাটা মনে কষ্ট পেয়ে ফিরে গেছে। এমনকি স্বামীর ব্যাপারে আশা ছেড়ে দিতে হয়েছে ব’লে হয়তো হতাশও হয়েছে।”

হাসতে হাসতে বিরূদা বললেন, “আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু একটু আগে সেই ভুলটা ভাঙল।”

“একটু আগে?”

“হ্যাঁ। উনি এসেছিলেন। এসে প্রথমেই বললেন, ‘পড়া পানি পেয়েছিলেন?’

‘না। হুজুর বাসায় ছিলেন না,’ চাপা মেরে দিলাম।

‘তাহলে এই নিন।’

উনি আমার জন্য পড়া পানি নিয়েই চ’লে এসেছেন! ইচ্ছে হচ্ছিল ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠি। কিন্তু ঢোক গিলে রাখলাম। স্মিতহাস্যে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে পানিটুকু খেতে যাব এমন সময়ে তিনি আমাকে বাঁধা দিয়ে বললেন, ‘এখন না, আমি যাবার পর খাবেন। খাওয়ার সাথে সাথেই কাজ শুরু করে।’

বিরূদার কথা শুনে সশব্দ হাসি আর থামিয়ে রাখা গেল না। উনি নিজেও মন খুলে হাসলেন। ব'লে চললেন, "ভদ্রমহিলা আসলে খুব সরল-সোজা। নিজের অজান্তেই মনের কথা ব'লে ফেলেছেন।"

"মজার ঘটনা।"

"উনি বসলে পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ ব্যাপারে আপনার স্বামীকে কিছু বলেছেন?'

'সইতে না পেরে গত রাতে কথাটা পাড়লাম। সে ব্যাপারটাকে প্রথমে হেসেই উড়িয়ে দিল। ওনার কাছে এটা যেন কোন ব্যাপারই না। তার পর যা বলল, তাতে কার না খারাপ লাগে? ও ধরনের কথা বলবে বুঝেই আমি কোনো দিন ওকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করিনি।'

'কী বললেন উনি?'

'কথাটা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'বলেনই না একটু।'

'ও বলল—দ্যাখ বিজরী, সুন্দরী মেয়েদের এবং মহিলাদের দিকে যদি কোনো পুরুষই না তাকাত, তাহলে কমপক্ষে তাদের শতকরা আশি ভাগ আত্মহত্যা ক'রে মরত।—আমার হাজবেন্ডটা বড্ড ঠোঁট-কাটা।'

'কিন্তু ঠোঁটের চিকিৎসা আমার চেয়ে আপনি ভালো বুঝবেন।'

'আমি আপনাকে ওর ঠোঁটের চিকিৎসা করতে বলিনি। এমনকি আপনার কাছ থেকে কোনো চিকিৎসা নিতেও আসিনি। আপনাকে খুব সরল-সোজা লোক মনে হয়েছিল। তাই আপনার উপকারটা করতে এসেছিলাম। তবে আমি এখনও বলছি যে আপনি একজন ভালো মানুষ।'

এই ব'লে উনি গোস্যা দেখিয়ে চ'লে গেলেন। তখন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"মজার ঘটনা। নারী মনস্তত্ত্বের এই দিকটা একটু ব্যাখ্যা করবেন?"

“আর রাখ তোমার ব্যাখ্যা। আগে গল্প শুনে নাও। এর ঠিক উল্টো ঘটনাও আছে। তা শুনলে তোমার আরো খটকা লাগবে।”

“তাহলে তাই হোক, আর চা হোক।”’

“বলছি শোন। —ওরে কেরামত, চা দিতে এত দেরি করলি কেন রে? আর, শোন, সাড়ে তিনটা বাজতে গেল, খালি চা দিলি? চায়ের সাথে টা দিবি না?—ও, যা বলছিলাম....উল্টো ঘটনা। একবার—বেশ আগে, আট-নয় মাস তো হবেই—এক পরমা সুন্দরী ভদ্রমহিলা তার অনুগত ভক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এলেন।”

“অনুগত ভক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ?”

“হ্যাঁ।”

“সে কেমন?”

“এসে বললেন, ‘ডাক্তার সাব, প্লিজ কিছু একটা করেন।’

‘বলেন কী করতে পারি আপনার জন্য।’

‘আমার জন্য নয়, আমার স্বামীর জন্য। নারী-ঘটিত ব্যাপার।’

‘মহিলাদের দিকে তাকায়, এই তো?’

‘ঠিক তার উল্টোটাই। এক দম তাকায় না।’

‘আপনার দিকেও না।’

‘আমার দিকে তাকাবে না কেন। ভালোভাবেই তাকায়।’

‘তাহলে তো চমৎকার স্বামী।’

‘আমি কি বলেছি খারাপ স্বামী? সমস্যাটা হলো অফিসে মার্কেটে বা পথে-ঘাটে আর কোনো মহিলার দিকে তাকায় না।’

‘এটা বুঝতে পেরেই তো বলছি ভালো স্বামী।’

‘কিন্তু তাতে আমার খুব ঝামেলা হচ্ছে।’

‘কেমন?’

‘আর দশটা মহিলাকে না দেখলে সে কিভাবে বুঝবে আমি কত সুন্দর?’”

“বিরূদা, এ আপনি কী শুনলেন?” হাসতে হাসতে বললাম আমি।

“মহিলাটা আসলেও খুব সুন্দর এবং তাঁর নিজেরও পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস আছে যে তিনি পরমা সুন্দরী। বুঝলে রাজন, নারীর সৌন্দর্য-চেতনার সাথে তুলনার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। মানুষের সীমাবদ্ধতা এমন যে, নিজেকে জানার জন্য তার প্রধান উপায় হলো অপরের সাথে নিজেকে তুলনা করা। নারী চায় পুরুষ তাকে অন্য নারীর সাথে তুলনা করুক এবং এভাবে তার শ্রেষ্ঠত্বকে তার কাছে তুলে ধরুক।”

“সে কি তাহলে নিজেকেই তুলনামূলকভাবে জানতে চায়?”

“তা তো বটেই। তবে শুধু তাই নয়, সে জানতে চায় পুরুষটা তাকে তুলনামূলকভাবে জেনেছে কি না।”

“আর মহিলাটা যদি হয় কুৎসিত?”

“তখনও সে তুলনা চায়—তার চেয়ে আরো কুৎসিত যে আছে তার সাথে। কিংবা তখন সে রূপ বাদে অন্য বিষয়ের তুলনা বেছে নেয়।”

“তারপর আপনি কী ওষুধ দিলেন?”

“আমি বললাম, ‘আপনি মাঝে-মধ্যে তাকে উস্কে দিবেন। এই যেমন দুজনে মিলে মার্কেটে গেলেন, আপনার সুবিধা মতো কিছু মহিলাকে দেখার জন্য তাকে কৌশলে উস্কে দিতে পারেন। সরাসরি দেহের বা সৌন্দর্যের কথা না ব’লে এমনও বলতে পারেন—দ্যাকো তো মহিলাটার শাড়িটা কেমন দেখাচ্ছে, কিংবা, হায় হায়, মহিলাটা কত ছোট ব্লাউজ পরেছে দ্যাখ—ইত্যাদি।’

‘তাও ক’রে দেখেছি। কাজ হয় না। সে আমাকে নিয়েই সুখী।’

‘তাহলে আপনি তার সুখ চান না?’

‘চাইব না কেন? কিন্তু আমার বুঝার দরকার আছে না সে কত সুখী?’

‘তা আছে। তাহলে আপনি এক কাজ করতে পারেন। একটা ভালো কৌশল।’

‘ভালো কৌশলের জন্যই তো আপনার কাছে আসা।’

‘আমার ওপর কনফিডেন্সের জন্য ধন্যবাদ। শুনুন তাহলে। কৌশলটায় কাজ হবে। আচ্ছা, আপনি কোন কোন দিকে বেশি সুন্দর ব’লে আপনি মনে করেন?’

‘তা আমি বলব কেন? আপনি তো দেখলেই বুঝতে পারছেন।’

‘সত্য বলতে কি, আমার মতে আপনি অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু আমি তো শুধু আপনার মুখ এবং মার্জিত পোশাকের আদলটা দেখতে পাচ্ছি।’

‘আমি মার্জিত পোশাকই পরি।’

‘ফিগার বা দেহের গঠন ব’লে যা বুঝায়, সে ব্যাপারে কি আপনি নিজের ওপর সন্তুষ্ট?’

‘মা-খালার এবং ননদ-শাশুড়িরা বলে আমার দেহের গঠনটা ব্যতিক্রমধর্মী এবং...কী বলব...’

‘বুঝতে পেরেছি। আপনি মানুষটা মোটা-সোটা নন, আবার কাঠ-খোট্টাও নন। আচ্ছা, কোন সাইজের ব্লাউজ পরেন?’

‘জ্বী...ছত্রিশ।’

‘বিস্ময়কর! তাহলে আপনি এক কাজ করুন। স্বামীকে নিয়ে বাইরে বেরুবার সময়ে এমনভাবে পোশাক পরবেন যেন কাপড়ের সীমানা চুয়ে চুয়ে আপনার সৌন্দর্য বিভিন্ন স্থান থেকে উপচে পড়তে চায়। আমি একেবারে বেয়াড়া পোশাকের কথাও বলছি না....এই ধরেন সালোয়ার কামিজ কিংবা শাড়ি...তবে তার মধ্য দিয়ে আপনার অসাধারণত্ব কিছুটা বৈপ্লবিক কায়দায় ফুটে ওঠা চাই....মানে....সম্ভবত আমি কী বলতে চাচ্ছি তা আপনি বুঝতে পারছেন।’

‘জ্বী, তা পারছি, কিন্তু...’

‘বিশেষ ক’রে কোমরের ভাঁজ এবং নিচের কায়াটা আর সামনের দিকের ....অর্থাৎ বুকের সংগ্রামী ভাবটা...’

‘জ্বী, বুঝেছি, কিন্তু....’

‘মনে রাকবেন, ঘরের মধ্যে যাই-করুক না কেন, পথে-ঘাটে পুরুষেরা এই দিকগুলোর দিকেই বেশি খেয়াল রাখে।’

‘কিন্তু...’

‘দুয়েক দিন আপনি এরূপ পোশাক পরলে আপনার স্বামী কোনো আপত্তি করবেন নাকি?’

‘না, না, সে অনেকখানি উদার।’

‘তাহলে আর কোনো কিন্তু নয়। যা বললাম দুয়েকদিন তাই ক’রে দ্যাখেন।’

‘তাতে ফল কী হবে?’

‘তখন বাইরের অসংখ্য পুরুষ-চোখের তীর আপনাকে চারদিক থেকে বিদ্ধ করবে। যেখানেই যাবেন, গাদা গাদা টর্চ-লাইটের মতো আপনার দিকে ফোকাস ক’রে থাকবে। ঘটনাটা আপনার স্বামীকে বিব্রত করবে। তখন আপনি কৌশলে এবং গোপনে তার চোখকে আকৃষ্ট করবেন।’

‘নিজের দিকে?’

‘না। অন্যের দিকে।’

‘কিন্তু আগেই তো বলেছি সে অন্য মহিলাদের দিকে তাকায় না।’

‘মহিলাদের দিকে নয়, পুরুষদের দিকে।’

‘মানে?’

'আপনার দিকে যে গাদা-গাদা পুরুষ উৎসুক হয়ে তাকাচ্ছে, সে ঘটনাটা আপনি আপনার স্বামীর গোচরে আনবেন। এমনও মন্তব্য করতে পারেন—ব্যাটারা কোনো দিন মেয়েমানুষ দ্যাখেনি? চোখ হা ক'রে তাকিয়ে আছে। দ্যাখ, দ্যাখ...। তখন আপনার স্বামী বিষয়টাকে সক্রিয় বিবেচনার মধ্যে আনবেন। তখন তিনি প্রথমেই তাকাবেন পার্শ্ববর্তী অন্যন্য মহিলাদের দিকে। তাদের দিকে না তাকিয়ে সবাই আপনার দিকে কেন তাকাচ্ছে তা তদন্ত ক'রে দেখতে চাইবেন। এভাবে অন্যান্য অনেক মহিলাকে তার দেখা হয়ে যাবে এবং তারপর একটা চমৎকার ঘটনা ঘটবে।'

'কী ঘটনা?'

'তারপর তিনি তাকাবেন আপনার দিকে। আপনাকে নোতুন ক'রে দেখতে শিখবেন। আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে। অত্যন্ত সুন্দর স্ত্রী পাওয়ার কারণে তিনি এক জাতীয় সামাজিক গর্ব অনুভব করবেন। তবে যেহেতু আমাদের দেশের সমাজটা উগ্র, সেহেতু কোনো সমস্যার আশংকা করলে তিনি আপনাকে আবারও মার্জিত পোশাক পরার পরামর্শ দিতে পারেন।'

'তাতে আমার আপত্তি নেই। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, অসংখ্য ধন্যবাদ।'"

আমি বললাম, "বিরূদা, নারী-পুরুষ উভয়ের মনকে আপনি এত স্বচ্ছভাবে জানেন তা আগে অনুমান করতে পারিনি। আচ্ছা, সেই পড়া-পানির মহিলা যদি আবার আসে, তাহলে আপনি কি তাকে এই জাতীয় কোনো উপদেশ দিবেন?"

"সুন্দর কথা বলেছ। কী হে রাজন, তুমিও যে দেখছি নারীবিশারদ হয়ে যাচ্ছ। আসলে এরূপ কৌশলে তারও কাজ হবে। তবে এমন মহিলাদের উপস্থিতিতে তাকে কৌশলটা করতে হবে যারা রূপে-গঠনে তার চেয়ে খারাপ।"

বিরূদা ব'লে চললেন, "এই জাতীয় আরেকটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে, যা অবশ্য একবারে ভিন্ন। ঘটনাটা না ব'লে পারছি না।"

"আমিও তা না শুনে পারছি না।"

"সম্ভবত তের চৌদ্দ মাস আগের ঘটনা। একদিন এক মহিলা দরোজায় এসে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছেন। মহিলটার মুখের চেহারাটা খুব সুন্দর। সম্ভবত কারো কাছ থেকে

আমার ঠিকানা নিয়ে তিনি এসেছিলেন। তার ধারণা ছিল যে এটা চেম্বার, বৈঠকখানা নয়। তাই পর্দার ওপাশ থেকে কয়েকবার উঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। আমি ভেতরে ব'সে একটা বই পড়ছিলাম। তাকে স্বাগত জানালাম—মানে বসতে বললাম। কিন্তু তার সন্দেহ যাচ্ছিল না। চারদিকে ভীত আগন্তুকের মতো তাকাচ্ছিলেন। সেই সুযোগে এক নজরেই আমি তার পোশাক-অভ্যাস এবং সার্বিক দৈহিক গঠন সম্বন্ধে আঁচ ক'রে ফেললাম। সুন্দর দামী শাড়ি পরেছেন। পেট এবং নাভির নিচের কিছু অংশ বের হয়ে আছে। এক-পাটি শাড়ি বুকের ওপর এমনভাবে টেনে দেয়া যে দেখে মনে হবে শাড়িটাকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। মসৃণ স্বচ্ছ শাড়ি। তার মধ্য দিয়ে ব্লাউজের রং এবং ডিজাইন দেখার জন্য চশমা লাগে না। বললাম, 'বিরূপাক্ষ সরকারকে খুঁজছেন?'

'জ্বী।'

'আপনি তার সামনেই আছেন।'

উনি মনে করলেন যে বিরূপাক্ষ সরকার ওনার পেছনে। ফলে দিগ্‌ভ্রান্তের মতো একবার ঘুরে তাকালেন। দৃষ্টিগোচর হলো তার পোশাক-অভ্যাসের পশ্চাদ্‌-দৃশ্য: ব্লাউজ থেকে কোমর পর্যন্ত লম্বাটে সরু পিঠ চৈত্রের নির্জল মাঠের মতো খা খা করছে। বললাম, 'আপনি যাকে খুঁজছেন আমি সেই অধম।'

'ও, সরি।'

'না, না, তাতে কী হয়েছে। বসুন প্লিজ। বলুন আপনার কী কাজে আসতে পারি।'

'আমার একটা সমস্যা হয়েছে। আমি ইচ্ছে করলে তা নিজেই সমাধান করতে পারি। কিন্তু সমাধানটা আমার কাছে বড় কথা নয়, আমার বুঝা দরকার ঠিক ওভাবে কেন তা সমাধান করতে হবে। ওর কথা মতো কেন সমাধানের নামে সমস্যাটাকেই নির্মূল করতে হবে।'

'দেখুন, সমস্যাটার সমাধান করা মানেই সমস্যাকে নির্মূল করা।'

'তা হোক, কিন্তু ওর কথা মতো তা কেন করতে হবে?'

‘অর্থাৎ তার কথা মতো আপনি সমস্যাটার সমাধান চান না, এই তো?’

‘ঠিক তাও নয়। আমার বুঝা দরকার সে সমস্যাটার সমাধান ঠিক ওভাবে চায় কেন?’

‘সমস্যাটা কার—আপনার না তার?’

‘সৃষ্টি করেছি আমি, তার মতে, এবং ভুগছে সে, তার মতে।’

‘তাহলে তো সব ঝামেলাই তাকে নিয়ে। সুতরাং সম্ভব হলে তার কথা মতোই সমস্যাটার সমাধান হওয়া উত্তম।’

‘কিন্তু আপনি তো কোনো কিছু না শুনেই সমাধান বাতলে দিচ্ছেন?’

‘সরি। আসলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টকে তার কথা শেষ করতে দেই না, কথার মধ্যে বাঁ-হাত চালিয়ে দেই। ডাক্তার মানুষ তো। ইচ্ছে ক’রেই এরূপ করতে হয়। সমস্যাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা জানার এটা একটা চমৎকার উপায়। এবার বলুন আপনার সমস্যাটা কী।’

‘আপনি কি একটু আগে আমাকে তাকিয়ে দেখেছেন?’

মনে মনে ভাবলাম, এই সেরেছে, আবার কোনো অভিযোগ তুলবে নাকি। চেয়ারে ব’সে তার এপিঠ ওপিঠ সবই তো দেখেছি। বললাম, ‘সামনে কেউ আসলে তো দেখতেই হয়। ডাক্তার তার রোগীকে দেখবে না? প্রয়োজন হলে চেক-আপও করতে হয়।’

‘আহা, কাইন্ডলি বলেন আপনি আমাকে দেখেছেন কি না।’

‘জ্বী, দেখেছি। সামনে এবং পেছনে।’

‘তাহলে আর নোতুন ক’রে চেক-আপের দরকার হবে না। আমার বেশ-ভূষা সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া করেছেন কি?’

‘দেখেছি তবে আইডিয়া করিনি।’

‘আমাকে একটু আগে যে-পোশাকে বা পোশাকের যে-স্টাইলে দেখেছেন, আমি ঘরের বাইরে একা বা স্বামীর সাথে ঠিক এরকম পোশাকেই বের হই।’

‘এটাই সমস্যা?’

‘না, এটা হলো সমস্যার কারণ। সমস্যা হলো এই যে, আমার স্বামী চায় না যে আমি এভাবে পোশাক প’রে বাইরে বের হই।’

‘আপনি আমার পোশাক-অভ্যাস পাল্টাতে চান না?’

‘তা তো আগেই বলেছি।’

‘আচ্ছা, আপনার স্বামী কি ধার্মিক-মনা?’

‘এক দম না। বরং বলতে চায় যে সে নাস্তিক।’

‘শিক্ষাগত যোগ্যতা?’

‘আমরা দুজনেই মাস্টার্স। ক্লাসমেট ছিলাম। ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম।’

‘বিয়ের আগেও কি...?’

‘তখন সালোয়ার কামিজ পরতাম। শাড়ি পরতাম ক্বদাচিৎ।’

‘আপনার স্বামীর ফ্যামিলিতে...?’

‘ওর বোনেরা, ভাগ্নীরা, এমনকি ওর মা-ও সচরাচর এভাবে পোশাক পরে।’

‘আচ্ছা...তাদের কাউকে কি তিনি বিশেষত তাদের ওরকম পোশাক-অভ্যাসের জন্য ঘৃণা করেন?’

‘একদম না। বোন-ভাগ্নী-মা-কে নিয়েও তো সে মার্কেটে যায়। এবং তারা এরকম পোশাকেই থাকে।’

‘উনি আপনাকে আপনার পোশাকের ব্যাপারে কী বলেন?’

‘অনুরোধ করে আমি যেন হয় সালোয়ার কামিজ পরি না হয় শাড়ি দিয়ে সমস্ত শরীর পুরোপুরি ঢেকে রাখি। তা না করলে মনে কষ্ট পায়।’

‘অন্য কোনো পর্দার কথা বলেন?’

‘না।’

‘রাতে আপনারা ঘনিষ্ঠ হবার সময়ে উনি কি আলো পছন্দ করেন নাকি অন্ধকার?’

‘আমি চাই লাইট অন্ ক’রে রাখতে, ও চায় অন্ধকার কিংবা বড় জোড় ডিম লাইট।’

‘ও.কে. আমাকে একটু আপনার সাহায্য করতে হবে।’

‘কিভাবে?’

‘আপনার স্বামীকে আমার কাছে পাঠাতে হবে। আপনি তাঁকে বলবেন না যে আপনি আমার কাছে এসেছিলেন। আমিও তা বলব না। আপনি তাকে এখানে পরামর্শের জন্য পাঠাবেন। বলবেন যে আপনার এক বান্ধবীর কাছ থেকে আমার ঠিকানা পেয়েছেন। কী, পারবেন না?’

‘তা পারব। আমাদের মধ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পর্কে খুব ভালো। কেবল আমার এই পোশাক-অভ্যাসের জন্য সে মনে খুব কষ্ট পায়।’

‘আচ্ছা থাক, দরকার নেই। আপনারা কি দুয়েক দিনের মধ্যে বাইরে কোথাও শপিং-এ বেরুবেন?’

‘হ্যাঁ, কাল বিকালে নিউমার্কেট যাব একটু। ওর কয়েকটা কম্পিউটারের বই কিনতে হবে। সেই সাথে আমিও টুকিটাকি কেনা-কাটা সারব। ছোট ননদটাও সাথে যেতে যেতে পারে।’

‘তাহলে ওখানেই ওনার সাথে পরিচয় হবে।’

‘কিভাবে?’

‘এই নিন আমার একটা কার্ড। আপনি আপনার স্বামীকে বলবেন যে কার্ডটা আপনাকে আপনার এক বান্ধবী দিয়েছে। একটা দোকানের নাম বলছি, সেখানে গিয়ে আপনার স্বামীকে কার্ড দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে বলবেন তারা আমার সম্বন্ধে কিছু জানে না। আমি অবশ্যই ওখানেই থাকব। আকস্মিকভাবে পরিচয়টা হয়ে যাবে। তারপর তার সাথে আলাপ ক'রে অন্য কোনোভাবে তার অনিচ্ছার কারণটা জেনে নিব এবং সমস্যার ইতিবাচক সমাধানের পথ বাতলে দেয়ার চেষ্টা করব।’

ভদ্রমহিলা কিছুটা হতাশ হয়ে চ'লে গেলেন। তবে এক দিন পর তিনি আবারও আমার কাছে এসে হাজির। প্রথমেই অভিযোগ, ‘ডাক্তার সাহেব, আপনি গতকাল যাননি যে? তাছাড়া দোকানদাররা কেউই তো আপনাকে চিনতে পারল না।’”

“তাহলে আপনি মহিলাকে ধোঁকা দিয়েছিলেন?” আমি বিরূদার কাছে জানতে চাইলাম।

“না, আমি তার সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়েছিলাম। আমি সেখানে ছিলামও, তবে দোকানে নয়, অন্য একটা জায়গায় একটু গা-ঢাকা দিয়ে।”

“তাতেই সমাধান হয়ে গেল?”

“হ্যাঁ।”

“কিভাবে?”

“শোনো বলছি। উনি যখন আমার না-যাওয়া নিয়ে অভিযোগ করছেন, তখন আমি ওনার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছিলাম। কারণ তাকিয়ে দেখি এক দিনেই তার পোশাক-অভ্যাসের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। উনি আমার কাছে এসেছিলেন ঠিক সেই পোশাক প'রেই যে-পোশাকে তার স্বামী তাকে দেখতে চান।”

“অদ্ভুত! কিভাবে তা হলো?”

“বলছি শোনো। আমি ওনাকে বললাম, ‘দুঃখিত। বিশেষ সমস্যার কারণে যেতে পারিনি। দোকানের কেউ আমাকে চেনে না বটে, তবে ভেবেছিলাম আগে থেকে পরিচিত হয়ে থাকব, যেন আপনারা খোঁজ করলে তারা বলতে পারে আমি তখন কোথায় আছি। যাহোক, এখন নোতুন ক'রে পদক্ষেপ নেয়া যাবে।’

উনি বললেন, ‘ধন্যবাদ, কিন্তু তার আর দরকার হবে না। আসলে ডাক্তার সাহেব, রাতে অনেক চিন্তা ক’রে দেখলাম স্বামীর কথাই আমার মেনে চলা উচিত। তাছাড়া সে তো আমাকে শেকলে বেঁধে রাখছে না। এই সামান্য কারণে উঠতে-বসতে-খেতে-ঘুমাতে তার সাথে মনোমালিন্য করব তা ঠিক না। এখন বেশ ভালোই আছি।’

আমি বললাম, ‘আপনি আসলেই বুদ্ধিমতী।’

ভদ্রমহিলা হাসিমুখে চ’লে গেলেন।”

“তাহলে কি আপনার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা আছে, বিরূদা?” আমি ঔৎসুক্যভরে জানতে চাইলাম।

উনি বললেন, “আরে পাগল, না। অলৌকিক ক্ষমতা কি এত সস্তা?”

“তাহলে?”

“আসলে রাজন, আমি মহিলার স্বামীর সমস্যাটা বুঝতে পেরেছিলাম। প্রথম দিনে মহিলাটার দিকে তাকিয়েই আমি তা বুঝেছিলাম। আবার নিউমার্কেটে তার স্বামীর এবং তার ননদের চেহারা দেখেও বুঝতে পেরেছিলাম সমস্যাটা আসলে কোথায়।”

“কী সেই রহস্য?”

“দেখলাম তার স্বামী দেখতে এক জন সুপুরুষ। তার ননদের মুখের চেহারাটা তেমন ভালো না হলেও পেটের জ্যামিতি এবং দেহের সার্বিক গড়ন-গাড়ন আদর্শ মানের। দেখলে কোনো যুবকের ভির্মি লাগবেই। উজ্জ্বল রং। সুগভীর নাভি...ইত্যাদি ইত্যাদি।”

“কিন্তু তার সাথে মহিলার দাম্পত্য-সমস্যার কী সম্পর্ক?”

“আসলে মহিলাটার মুখটা দেখতে সুন্দর হলেও তার দেহের গড়নটা তেমন সুন্দর নয়। পেটটা কতকটা বাদামী রঙের, নাভিটা ভাসা-ভাসা, পেট বের ক’রে শাড়ি পরলে পেটটাকে মনে হয় খেজুর গাছের রস ধরার জন্য ঝুলানো মুখ ভোঁতা কলসের

মতো। কোমরের মেরুদণ্ডের হাড়ে ভেতরমুখী ভাঁজ নেই। ফলে তা বের ক'রে দিলে মাছের দাঁড়ার মতো কুৎসিত দেখায়। পেছন দিকে কোমরের উপরের এবং নিচের দিকের আকৃতিতে কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই, ওঠা-নামা নেই। ফলে তার স্বামী চাইত না যে সে অত সুন্দর মুখের সামাজিক মূল্যটাকে সেই খেঁজুর গাছের মতো অমসৃণ কোমরের ঋণাত্মক দৃশ্যের দ্বারা নষ্ট করুক। স্বামীরা চায় আর দশ জনকে একটা সুন্দর স্ত্রী দেখাতে। মহিলার মুখটা সত্যিই প্রশংসনীয়। তার স্বামী চাইত যে সে শুধু তার মুখটাই জনগণকে দেখতে দিক। এমনকি সে নিজেও ব্যক্তিগত মুহূর্তে অন্ধকার বা ডিম-লাইট পছন্দ করত একই কারণে। তার স্ত্রীর অপরিশীলিত দেহাবয়ব তার আক্ষেপের কারণ ছিল। সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে ব'লেই চাইত যে তাকে সুন্দর দেখাক। অথচ তার স্ত্রী মনে করত যে তার মুখের মতো তার দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও খুব সুন্দর। তা না হলে গাদা গাদা লোক তার দিকে তাকিয়ে থাকে কেন? কিছু লোক তাকিয়ে থাকলেই মেয়েরা নিজেকে সুন্দরী ভেবে বসে। অথচ তারা বুঝতে পারে না যে ওটা ছেলে ছেলেদের স্বভাব।"

"মাই গড! একটা পুরুষের এই চাপা কষ্টও আপনি বুঝে ফেলেছেন? কিন্তু মহিলাটার বোধোদয় হলো কিভাবে?"

"কৌশল করেছিলাম। আমি আমার কিছু অতি-পরিচিত ছেলেকে আগে থেকেই দোকানটার কাছাকাছি আড্ডা দিতে বলেছিলাম। মহিলাটা যখন পাশ দিয়ে যায়, তখন তাকে উদ্দেশ্য ক'রে পরোক্ষভাবে কী মন্তব্য করতে হবে তাও ওদেরকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল। ওরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে মহিলাকে একই ধরনের মন্তব্য পর পর তিন বার শুনতে হয়েছিল। তাতেই তার লজ্জা এসে গেছে।"

"কী মন্তব্য করতে বলেছিলেন?"

"ওহ্, কত সুন্দর মুখ, অথচ কি বাজে কলসির মতো একটা পেট। মেরুদণ্ডটাও মাছের পিঠের মতো—এই জাতীয় কোনো কথা।"

"কিন্তু মহিলাটাকে বললেন কেন যে আপনি সেদিন নিউমার্কেটে যাননি?"

"লজ্জা পেত।"

হাসতে হাসতে বললাম, "বিরূদা, আমার মনে হচ্ছে আপনি বয়েস কালে খুব দুষ্টু ছিলেন।"

"তা মিথ্যে বলনি। অনেক দুষ্টু ছিলাম। তবে এটা সত্য যে, কোনো মহিলার সাথে কোনো দিন বে-আদবি করিনি। এ কারণে আমার দুষ্টুমিকে সচরাচর কেউ খারাপ চোখে দেখত না। আর একটা ব্যাপার হলো, যতই দুষ্টুমি করি না কেন, কোনো মেয়ে বা মহিলা কাছে এলে বেয়াড়ার মতো তার শরীরের যেখানে সেখানে তাকাতাম না, এমনকি সরাসরি চোখের দিকেও তাকাতাম না। অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত অবস্থায় সান্নিধ্যের মুহূর্তে মেয়েরা ছেলেদের অবনত দৃষ্টিই বেশি পছন্দ করে। তাহলে একটা গল্প বলি, শোন। বাস্তব ঘটনা।

ছাত্রজীবনে আমি আমার এক বন্ধুর সাথে কোনো একটা বইয়ের মার্কেটে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে বিভিন্ন ভার্সিটি কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আসে বই কিনতে। বিশেষ ক'রে বিকেলে এবং সন্ধ্যায় প্রচুর লোক সমাগম থাকে। আমরা গিয়েছিলাম একটা বই কিনতে। অদূরে একটা দোকানে দাঁড়িয়ে বই দেখছিল দুটি মেয়ে। তাদের এক জনের চেহারা বেশ সুন্দর। বিশেষ ক'রে তার সমৃদ্ধ শরীর তার পোশাকের কার্পন্যকে অবলম্বন ক'রে জলের বিম্বের মতো তাকিয়ে রয়েছে। ফিনফিনে ওড়না, তাও বই ঘাটাঘাটির ব্যস্ততায় ওড়নাটা তার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন। আমরা এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম যেখান থেকে বলিষ্ঠ মেয়েটাকে পাশ বরাবর দেখা যায়। মেয়েটা বই ঘাটছে আর মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। সে যখন আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, তখন আমি মুহূর্তের মধ্যে চোখ ঘুরিয়ে ফেলছি। কিন্তু আমার বন্ধুটা মাঝে মাঝে বড় বড় নিঃশ্বাসও ছাড়ছে—ভাবখানা এমন যেন বুকের মধ্যে কিছু হাহাকারী নিঃশ্বাস জমা হয়ে আছে এবং শব্দ ক'রে তা না ছাড়লে সে ছাড়ার কোনো মানে হয় না। একটু পরে মেয়ে দুটো কাছাকাছি আরেকটা দোকানে চ'লে এল বই খুঁজতে। হেঁটে আসতে আসতে তারা আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু আমি চোখটা ঘুরিয়ে নিলাম। আমার বন্ধুটা সরাসরি তার চোখের দিকে এবং তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে তার সারা দেহের দিকে তাকাতে লাগল। তারা সেই দোকানটাতেও কিছুক্ষণ বই ঘাটাঘাটি করল। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটার রূপে আমার বন্ধুটা একেবারে পাগল। আমাকে বলল, দোস, ওকে আমি বিয়ে করব। ওর পেছন পেছন যাব ওর ঠিকানা জানার জন্য। ঠিক এমন সময়ে ঠাস! আমার বন্ধুটার গালে একটা থাপ্পড় মেরে মেয়েটা হাঁটা দিল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য সে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও।

এদিকে ব্যাপারটা লজ্জারও বটে। আশে-পাশের কেউ দেখে থাকলে লজ্জায় মরতে হবে। এসব বুঝে আমার বন্ধুটা জোরে হেঁটে তাদের সামনে গিয়ে তাদের পথ আটকাল, “আমি আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি?”

মেয়েটা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বেয়াদবির আর জায়গা পান না?’

‘কী বেয়াদবি করেছি?’

‘মানুষের দিকে কিভাবে তাকাতে হয় তা শেখেননি?’

‘কিন্তু আমার এই বন্ধুটাও তো আপনার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেও তো আপনার সব কিছু দেখেছে।’

‘চুপ করেন । সে আমার কী কী দেখল তাতে আমার কিছু আসে যায় না, আসল কথা হলো সে আমাকে *কীভাবে* দেখল।’

এই ব’লে তারা চ’লে গেল। আমারও চট্‌জলদি জায়গা পাল্টালাম।

তাহলে দেখলে রাজন, তুমি কোনো মেয়ের দিকে তাকালে কি না সেটা তার কাছে বড় কথা নয়, তার কাছে বড় কথা হলো তুমি তার দিকে কিভাবে তাকালে।”

“অদ্ভুত ঘটনা!”

“অবশ্য তারপর আমি আমার বন্ধুটাকে ব্যাখ্যা ক’রেও বুঝিয়েছিলাম মেয়েটার তাৎক্ষণিক মনস্তত্ত্ব। তার প্রথম কথাটাও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে বলেছিল, বেয়াদবির জায়গা পান না? তার মানে এই যে, বেয়াদবিতে অনেক সময়ে আপত্তি না-ও থাকতে পারে, তবে দোষ যত জায়গাটার। সরাসরি লোলুপের মতো মেয়েদের দিকে তাকানো যায় এবং তাকাতে হয়ও—একেবারে ব্যক্তিগত মুহূর্তে। অন্যান্য সামাজিক মুহূর্তে তারা এরূপ আচরণকে প্রতিরোধ করে। সম্ভবত নিজেকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাদেরকে যে-কষ্ট পোহাতে হয়, তারা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে তার প্রতিশোধ নেয়। অথচ খেয়াল ক’রে দেখবে, তুমি যদি তোমার ঘনিষ্ঠজনের সাথে ব’সে ব্যক্তিগত আলাপ করার সময়ে তার দিকে লোলুপের মতো না তাকাও, তাহলে সে বিরক্ত বোধ করবে—এমনকি তোমাকে কয়েকবার উস্কে দেয়ার পর অপরাগ হলে কাপুরুষ ব’লে গাল পাড়তেও দ্বিধা করবে না।”

“কিন্তু, বিরূদা, আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা ন্যাচারাল। নারীর আচরণের এই দিকটাকে পুরুষের স্বাভাবিকভাবেই মনে নেয়া উচিত। কী বলেন?”

“ঠিক বলেছ। আত্মরক্ষার প্রবণতাটা মেয়েদের মধ্যে স্বাভাবিক। তা তাদের জন্মগত বা প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আরেকটু মৌলিক পর্যায়ে ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে *এই আত্মরক্ষা নিজেকে অপরের হাত থেকে রক্ষা করা নয়, এর পেছনে কাজ করে নিজের কাছ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য।* তার ক্ষোভ—‘ওভাবে তাকালে যে আমি ফেটে পড়ব, পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হব, নিজের কাছে নিজে হেরে যোবে, সামাজিক মূল্য হারাব, অযৌক্তিক আচরণ ক’রে নিজেই নিজের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করব, অবিবেচকের মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলব, বর্তমান ভবিষ্যৎ সব রসাতলে যাবে। সুতরাং তুমি আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ো না। আমি প্রতিবাদ করতে বাধ্য হব।’ নিজের বিরুদ্ধে নিজেকে সংগ্রাম করতে হওয়ার এই আক্ষেপ তাকে বাহ্যিকভাবে প্রতিবাদমুখর ক’রে তোলে। কিশোরীদের আচরণ থেকেও এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে। কিশোরী যত যৌবনে পদার্পণ করতে থাকে, তত তার খেলার সাথীদের সাথেও তার ভৌত দূরত্ব বেড়ে যেতে থাকে। কেউ তাকে শিখিয়ে দেয়নি যে তাকে তার অমূল্য রূপ-যৌবন-সতীত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব নিজের ঘাড়েই নিতে হবে। যৌবনের আগমনই তার মধ্যে নিজস্ব প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে আসে। এটাই স্বাভাবিক। সামাজিক বিভিন্ন ভীতি না থাকলেও যৌবনের নিজস্ব এরূপ একটা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকে। মুক্ত-যৌনতার অবাধ প্রথাও তাকে থামাতে পারে না, সুপ্ত রাখতে পারে মাত্র। বিভিন্ন উপজাতীয় বিবাহ-পূর্ব বলাৎকার প্রথাও এ কারণে সেই উপজাতীয় মেয়েরাই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তারা তাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে কেবল তখন যখন তারা নিজেরা আর কিশোরী থাকে না। কৈশর পর্যন্ত মানব সন্তানের যে রূপ এবং স্বভাব, তা বহুলাংশে প্রাকৃতিক। তার পর মানুষ আর প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, তখন সে প্রথা সমাজ বিশ্বাস সংস্কার ইত্যাদি কৃত্রিমতার সৃষ্টি। কৃত্রিমতা কখনও প্রকৃতিকে বুঝতে পারে না। এ কারণে বাবারা ছেলেদের মন বোঝে না, মায়েরা মেয়েদের স্বপ্নের গুরুত্বটা অনুভব করতে পারে না। কিশোর-কিশোরীর স্বাভাবিক প্রবণতা দেখে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক এবং প্রকৃতিক পার্থক্যটার মৌলিক দিকগুলোকে বুঝতে পারা যায়। একই বয়সের একটা কিশোর যখন হয় সচরাচর ওপর-পড়া বা এগ্রেসিভ, সেখানে কিশোরী হয় সচরাচর পলায়নপর বা ডিফেনসিভ। নারীর নারীত্বের মূল রহস্য বুঝতে হলে তাকাতে হবে কিশোরীর দিকে। নারী হলো সামাজিক ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি, কিশোরী হলো নারীত্বের প্রকৃতিক উৎস। এ কারণে ফ্রয়েড তার যাবতীয় তত্ত্বের সমাধান খুঁজেছেন শৈশবে এবং কৈশোরে। অবশ্য ফ্রয়েড এক চরম সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে এক বিশাল ভুলের ইমরত গড়েছেন। ফ্রয়েডের তত্ত্বাবলী মিথ্যা এজন্য নয় যে তা বেখাপ্পা শুনায় কিংবা তার সাথে বিখ্যাত ধর্মগুলোর বিরোধ খুব বড়—সব মৌলিক সত্যকে প্রাথমিকভাবে বেখাপ্পাই মনে হয় এবং সব ধর্মকেই মানুষ নিজের স্বার্থে ভুল পথে নিয়ে যায়—বরং তাঁর তত্ত্বের ভুল ছিল এখানে যে তিনি ভেবেছিলেন সঠিক সমস্যাকে চিহ্নিত করার যোগ্যতা মানেই সঠিক সমাধান দিতে পারার যোগ্যতা, এবং তিনি যেখানে সমস্যাগুলোকে পেয়েছিলেন সেখানেই তার সমাধান আছে। তিনি শত শত বার 'বিশ্লেষণ' (Analysis) শব্দটাকে ব্যবহার করলেও তিনি মনে করেছিলেন যে তিনি আসলে বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করছেন না, তার সত্যকে উদঘাটন করছেন। তিনি যেখানে Effect দেখেছেন, Cause কেও পাবার আশা করেছেন ঠিক সেখানেই, কেবল সময়ের মাত্রা ধ'রে একটু অতীতে পৌঁছে গিয়ে। শুধু সময়ের অতীতে গেলেই পূর্ণাঙ্গ অতীতে পৌঁছানো যায় না। অবশ্য এ ব্যাপারে তোমাকে আমি অনেক পরে বিস্তারিতভাবে বলব। আমরা আলোচনা করব একটা নোতুন তত্ত্ব নিয়ে, যা নারীর (এবং পুরুষের) যাবতীয় আচরণের যুক্তিসঙ্গত এবং সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা দেবে। তবে তার আগে নারীর মনের বিচিত্র বাস্তবতার কিছু খন্ডচিত্র তোমাকে দেখতে হবে। সত্যকে খুঁজে না পেলেও বাস্তবাতর মধ্যে তার লীলাখেলা দেখতে পারা বড় আনন্দের ব্যাপার।

নারীর আত্মরক্ষার প্রবণতা যে নিজের বিরুদ্ধেই নিজেকে রক্ষা করার প্রয়াস থেকে উদ্ভূত তা দেখানোর জন্য আরেকটা গল্প শুনাই। ক'দিন আগের ঘটনা। মাত্র তিন-চার মাস হবে। ঘটনাটা ঘটেছিল নিউ মার্কেটেই। আমি বই-পুস্তক কিনতে মাঝে-মধ্যে নিউ মার্কেটে যাই। সেদিন একটা স্টুডিও থেকে কিছু ছবিও ডেলিভারি নিতে হবে। পেতে একটু দেরি হবে। তাই পাশে দাঁড়িয়ে আছি, একটু ঘুরাঘুরিও করছি। নিউ মার্কেটের অবস্থা তো জানই। তরুন-যুবকদের আড্ডা দেয়ার তেমন সুবিধাজনক কোনো জায়গা ঢাকা শহরে না থাকায় অনেকে ওখানে আড্ডা দিয়ে অবসর সময়টুকু কাটায়, বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে, গল্প করে। সেদিনও লোক কম ছিল না। হঠাৎ পাশেই একটা হালকা মনোমালিন্যের চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। চোখ ফিরিয়ে দেখি একজন বোরখা পরিহিত সুন্দরী ভদ্রমহিলা তিনজন যুবকের একটা

গ্রুপকে ধমকাচ্ছেন, ‘কেন? তাকাতে হবে কেন? আপনাদের কি মা-বোন নেই, না কি?’

একটা ছেলে বলল, ‘কোন মহিলা তার সন্তানের কাছেই মা আর তার ভাইয়ের বিচারেই বোন। অত লেকচার দিচ্ছেন কেন? সবাই যদি সবাইকে মা-বোনের মতো দেখত তাহলে আপনার বিয়েই হতো না। মায়ের চেয়ে বেশি বয়সের মহিলাকেও কত জনে তো বিয়ে করে, সেসব দ্যাখেন না?’

‘যত্ত সব বেয়াদবের দল!’

‘গালাগালি দেবেন না, ম্যাডাম। আমরা আপনার কোনো ক্ষতি করিনি। ক্ষতি যদি করতাম তাহলে যে-কোনো অভিযোগ মাথা পেতে নিতমা।’

কথা কাটাকাটি হতে লাগল। মহিলাটাকে দেখে মনে হচ্ছিল উনি কারো জন্য অপেক্ষা করছেন। হয়তো তার সাথী তাঁকে ওখানে দাঁড়িয়ে রেখে শার্টের জন্য পাঁচটা বোতাম আনতে গেছেন, যা শপিঙের সময়ে মনে পড়েনি। ভদ্রমহিলা খুব চটে গেছেন দেখে আমি এগিয়ে গেলাম। ছেলেগুলোকে বললাম, ‘এই ছেলেরা, তোমরা এখন চুপ কর।’ মহিলাটাকে বললাম, ‘আচ্ছা, আপনার সমস্যাটাকে আমাকে একটু বলবেন?’

‘দ্যাখেন না, এই সব ফালতু ছেলেপেলের কারণে পথে-ঘাটে বেরোনোর কায়দা নেই।’

‘ওরা কি আপনাকে কোনো খারাপ কথা বলেছে?’

‘যেভাবে রাক্ষসের মতো তাকিয়ে থাকে, তার সাথে খারাপ কথার কোনো পার্থক্য আছে নাকি?’

‘এবার তোমরা বল, ওনার কাছে ক্ষমা না চেয়ে সরাসরি তর্ক শুরু ক’রে দিয়েছিলে কেন?’

ওদের একজন বলল, ‘না আংকেল, আমরা তা করিনি। উনিই প্রথমে বেয়াদব রাসকেল ইত্যাদি ব’লে গাল দিয়েছেন। আমরা বলেছি যে আমরা যদি আপনার দিকে তাকিয়ে দোষই ক’রে থাকি তাহলে মনে কিছু নেবেন না। উনি কিন্তু মা-বোন তুলে খিস্তি শুরু ক’রে দিলেন।’

‘তোমরা কি সবাই বন্ধু?’

‘জ্বী, সবাই বুয়েটে পড়ি। কারো দিকে তাকালে যে তাকে বেয়াদবি বলতে হবে তা তো কোনো দিন শুনিনি,’ জবাব দিল তাদের এক জন।

তখন ভদ্রমহিলা বললেন, ‘তাই ব’লে এক নিরিখে শিকারীর মতো তাকিয়ে থাকতে হবে নাকি?’

আমি মহিলাকে বললাম, ‘দ্যাখেন ইয়াং লেডি, আপনার সর্বাঙ্গ পর্দা দিয়ে ঢাকা। কেবল চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। আপনার সামান্য চোখ দুটো দেখেও ব’লে দেয়া যাচ্ছে আপনি শিক্ষিতা এবং সুন্দরী। সুতরাং ছোট-খাট পরিস্থিতি বোঝার যোগ্যতা আপনার আছে ব’লে আমি মনে করি। দ্যাখেন, আপনি যদি জানতেন এবং নিশ্চিত থাকতেন যে কেউ আপনার দিকে তাকাবে না, তাহলে আপনি পোষাক ছাড়াও বাইরে আসতে পারতেন, কারণ তখন কেউই আপনাকে দেখত না। কিন্তু আপনি পোশাক পরেই বের হয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিধিসম্মত পর্দার আশ্রয় নিয়েই বের হয়েছেন। কেন তা করেছেন? কারণ আপনি জানেন যে অনেকে আপনার দিকে তাকাবে। কেউ তাকালে যেন আপনার কোনো সমস্যা না হয় সেজন্যই তো আপনি নিজেকে ঢেকে রেখেছেন। তাহলে কেন সামান্য কারণে ভদ্র ছেলেদের সাথে অভদ্র ভাষা ব্যবহার করছেন?’

মহিলা আমার কথা শুনে প্রথমে একটু দমে গেলেন। এবং তারপর বললেন, ‘আপনি এক জন বয়স্ক মানুষ হয়েও একথা বললেন?’

‘দুঃখিত,’ বললাম আমি, ‘আর কোনো উপায় ছিল না। সামান্য কারণে এতগুলো লোক জড়ো হলো। এখন তো সবাই আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।’

উনি আর কোনো কথা বললেন না। আমি ছেলেগুলোকে ওখান থেকে ভাগিয়ে দিয়ে আমার কাজে চ’লে গেলাম।

আসলে রাজন, মেয়েদের সবচেয়ে বড় পরাধীনতা এই যে তাদের যখন ইচ্ছা থাকে না তখনও কিছু কিছু পুরুষ তাদের ভালোবাসা আদায় করতে চায়। সে কাজে পুরুষ পেশী-শক্তি এবং পশু-শক্তি উভয়ই ব্যবহার করে। ফলে মেয়েদেরকে অনেক সময়ে নিজের বিরুদ্ধে কষ্টকর সংগ্রাম ক’রে যেতে হয় নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার

জন্য। তার শত্রু কেবল বাইরে নয়, তার ভেতরেও, অর্থাৎ তার মানবীয় কামনা। এ থেকে এক জাতীয় মানসিক টেনশনের সৃষ্টি হয়। সে ভাবে, পুরুষ আমার কাছে এত পছন্দনীয়, অথচ তাকে আমি বন্ধুত্ব দিতে গিয়ে নিরাপত্তার আশ্বাস পেতে পারি না কেন? ঠিক একই পরিস্থিতির শিকার পুরুষেরাও। এই ভয়ের কারণেই বিবাহিত পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদেরকে পর্দার আড়ালে রাখতে চায়। সবাই যদি নিজের কাছে জবাবদিহি করার মতো যথেষ্ট সৎ হতো, তাহলে মেয়েদেরকে আর সামাজিক নিরাপত্তার জন্য পর্দার আড়ালে থাকতে হতো না। তখন পুরুষের সততাই হতো তার পর্দা। তার নিজের পর্দা ছাড়াই তার নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারত। অবশ্য তখন পর্দার প্রয়োজন হতো কেবল *নিজেকে* ঠেকানোর জন্য। নারীর প্রেম এবং কামনা প্রধানত সান্নিধ্য-সচেতন: অর্থাৎ সে যদি দ্যাখে যে কেই তাকে দেখছে, তখন সে ভাবে যে নিজেকে তার দেখা প্রয়োজন এবং এ কারণে নিজেকে আরো দৃষ্টি-নন্দন ক'রে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু এই সচেতনতার ক্লান্তি থেকে তাকে রেহাই দিতে পারে তার পর্দা। পর্দার মধ্যে থেকে সে আশ্বস্ত থাকতে পারে যে কেউ তাকে দেখছে না। ফলে নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করারও কোনো দরকার নেই। মানুষ সব সময়ে উত্তেজনার সংগ্রামের ক্লান্তি পছন্দ করে না। সে কাজের সময়ে বিশ্রাম চায়—নিজের মনের আগুন থেকে অব্যাহতি চায়।"

বিরূদা ব'লে চললেন, "নারী-পুরুষের সম্পর্কের বহু, বহু মাত্রা। আমরা কেবল তার কয়েকটা নিয়ে আলাপ করেছি। তবে আজ তত্ত্বকথা ভালো লাগছে না। সুতরাং বিচিত্র রহস্যরাজ্যের চেনা-পরিচিত জায়গাতে ঘোরাফেরা করা যাক। নারীর একটা বড় সমস্যা হলো, সে মনে করে যে তার স্বামী তাকে বোঝে না। পুরুষ তা জেনে কষ্ট পায়। সে যতই তাকে বুঝুক, তার কথা মতো না চললে সে মনে করে যে সে তাকে বোঝে না। ফলে পুরুষকে তার মন যুগিয়ে চলতে হয়। মন যুগি য়ে চলা মানে কোনো না কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেয়া। স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাচার এবং মিথ্যাচরণ মানুষকে বিবেক-যন্ত্রণা দেয়। ফলে তাকে আবারও কখনো কখনো কঠোর হতে হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অবশ্য শুধু ভুল-বুঝাবুঝি নিয়েই এই নাটক চলে না, এর মধ্যে থাকে অসন্তুষ্টি এবং হীনমন্যতার সমস্যা। তবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিব পরবর্তী কোনো এক দিন। আজ হালকাভাবে দেখব নারী-পুরুষের সম্পর্কের এই দ্বান্দিবক চরিত্রটার উপরি-কাঠামোটা কেমন।"

বিরূদার চোখ-মুখের প্রস্তুতি প্রস্তুতি ভাব এবং ন'ড়ে চ'ড়ে বসা দেখে মন্তব্য করলাম, "আবারও গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ছেন ব'লে মনে হচ্ছে।"

"ঠিক বলেছ। ভূমিকাটা তুমিই ব'লে ফেলেছ। সুতরাং এক দেশে ছিলেন এক রাজা। অমন রাজা পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ তাঁর কোনো ব্যক্তিগত ক্রোধ ব'লে কিছু ছিল না। থাকলেও তা তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারত না। তার যাবতীয় সিদ্ধান্তের এবং ক্রিয়াকাণ্ডের মূল ভিত্তি ছিল তার ভালোবাসা এবং কৌশল। রাজনৈতিক কৌশল। তিনি বলতেন, 'দেশ চালাতে হয় ভালোবাসা আর কৌশল দিয়ে।'

প্রথম দিকে অনেক প্রজা এবং সামন্তপ্রভু রাজার সাথে বিদ্রোহে লিপ্ত হলো। তিনি হুকুম দিলেন, 'দমন কর!'

রক্তপাত এবং লাঠিপেটার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করা হলো। এখন কেউ আর মাথা উঁচু ক'রে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না। তাতে রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা হলো।

কিন্তু শৃঙ্খলা আর সুখ এক কথা না-ও হতে পারে। তিনি তা জানতেন। বললেন, 'শৃঙ্খলা দিয়ে রাজ্য চলে, কিন্তু জাতিগঠন সম্ভব হয় না। উপযুক্ত জাতিগঠনের জন্য চাই সুখ। রাজ্যে সুখ ফিরিয়ে আনতে হবে।'

মন্ত্রী অনুগত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'মহারাজ, কী দেকে জানতে পারব যে রাজ্যে সুখ ফিরে এসেছে?'

'গল্প,' বললেন রাজা, 'যখন দেখবেন যে যেখানে সেখানে লোকেরা দলে দলে গল্প করছে, হাস্য-স্ফূর্তি করছে, তখন বুঝবে যে রাজ্যে সুখ ভ'রে গেছে।'

সুতরাং গরিবকে ধন দেয়া হলো। ধনীর কাছ থেকে খাজনা আকারে কিছুটা ধন কেড়ে নিয়ে সে কাজ করা হলো। সবার জান-মালের নিরাপত্তা দেয়া হলো।

কিছু দিন পর দলে দলে লোকেরা চায়ের দোকানে মাঠে চৌরাস্তায় গল্প-গুজব-হাস্য-রস করতে শুরু করল। রাজা বললেন, 'দেশে সুখ-শান্তির হাওয়া বইছে।'

মন্ত্রী বললেন, 'কিন্তু রাজনীতির প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি।'

মন্ত্রীর কথাই ফলল। হাস্য-রসের রঙ্গভূমি থেকে উঠে এল কলহ, হানাহানি, অপরাধ। রাজা বললেন, 'দমন কর!'

দমন করা হলো।

আর কেউ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায় না।

রাজা বললেন, 'সুখ কি এসেছে রাজ্যে?'

'না, মহারাজ, আসেনি,' বললেন মন্ত্রী।

'কিভাবে বুঝলেন?'

'এখন কেউ মাথা উঁচু করছে না ঠিকই, তবে কেউ মাথা নিচুও করছে না। রাজ্যে সুখ-শান্তির উপস্থিতির সূচক হলো তৃপ্তি। তৃপ্তির প্রকাশ ঘটে মাথা নত করার মধ্যে।'

'তাহলে কি মাথা কেটে ফেলতে হবে?'

'না মহারাজ।'

'তাহলে?'

'প্রত্যেকের মাথার ওজন বাড়িয়ে দিতে হবে, যেন তা আপনা থেকেই নুয়ে আসে।'

'কিভাবে?'

'এতদিন শাসন করেছেন, এখন শোষণ করুন।'

শোষণ শুরু হলো। ধনী হয়ে গেল গরিব। গরিব হলো ফকির। রাজা বললেন, 'মন্ত্রিবর, এবার কী করা?'

'হুজুর, এবার কৃপা করুন।'

শুরু হলো কাঙালিভোজ, কোষাগার থেকে অর্থদান, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ইত্যাদি। সারা দেশে ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল। চারদিকে রব উঠল, 'মহান

রাজা, মহান রাজা।' সবার মাথা নত হলো। মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, দেশে শান্তি ফিরে এসেছে।'

রাজা চুপ ক'রে রইলেন।

মন্ত্রী শুধালেন, 'মহারাজ মনে হয় খুশি হননি।'

'মন্ত্রিবর', বললেন মহারাজ, 'এখন সমস্যা হচ্ছে *আমার* মাথাটাকে নিয়ে।'

'সে কেমন, মহারাজ?'

'আমি বুঝতে পারছি না আমি *কেন* সার্থক হলাম।'

'মহারাজ, নিজেকে ও প্রশ্ন করবেন না। এ হলো রাজনীতি।'

'কিন্তু আমি তো চেয়েছিলাম ভালোবাসতে।'

'আপনি তো ভালোই বাসছেন, মহারাজ।'

'কিন্তু আমি কী ক'রে বুঝব যে আমি ভালোবাসছি? ভালোবাসার আনন্দ তো প্রথমে অনুভূত হয় নিজের মধ্যে। আমি তো সে আনন্দ পাচ্ছি না।'

'মহারাজ, ভালোবাসার আনন্দ এক কথা, আর তার সার্থকতা হলো অন্য কথা। রাজার ভালোবাসার মধ্যে সার্থকতা থাকা চাই।'

'আর আনন্দ?'

'প্রজারা সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ থাকছে এটা দেখেই আপনাকে আনন্দ পেতে হবে। মানুষের সুখের উৎস হলো কৃতজ্ঞতা। সে কৃতজ্ঞ থাকতে চায়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করতে পারলে সে অনুভব করতে পারে না যে সে সুখী।'

'তাহলে *আমার* সুখ?'

'আপনি কৃতজ্ঞ থাকবেন প্রজাদের প্রতি। তারা আপনার ওপর কৃতজ্ঞ আছে ব'লে আপনি তাদের ওপর কৃতজ্ঞ থাকবেন। আর প্রজারা কৃতজ্ঞ থাকবে এজন্য যে তাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রে রাখার যোগ্যতা আপনার আছে।'

‘কিন্তু ওরা এভাবে কতদিন কৃতজ্ঞ থাকবে?’

‘যতদিন থাকে। তারপর কিছু কিছু অনুগত প্রজাকে আবারও শত্রুতে পরিণত করা হবে। আবার তাদেরকে দমন করা হবে। রাজনীতির মৃত্যু নেই। মানুষ দমিত হতে চায়। ঘরে সুখ থাকলে সে বাইরে শত্রু খোঁজে। বাইরে শত্রু না থাকলে সে ঘরের মধ্যে শত্রু সৃষ্টি করে।’

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা তার বিশাল সিংহাসনের মধ্যে চুপসে গেলেন।”

বললাম, “বিরূদা, পুরো গল্পটাই একটা অপ্রিয় সত্য কথা। নির্লজ্জ সত্য।”

“ঠিক বলেছ রাজন। রাজার কাছেও ঠিক তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রী তাঁকে একথা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, সত্য যখন অপ্রিয় হয়ে যায় তখন তা আর সত্য থাকে না। অর্থাৎ সত্য যতই কঠোর এবং কষ্টদায়ক হোক না কেন, প্রজারা চায় যে তা যেন তাদের কাছে অপ্রিয় না হয়ে ওঠে। প্রজারা অপ্রিয় কোনো কিছুকেই সত্য বলতে চায় না।”

“নারী কি তাহলে কতকটা সেই নির্বোধ প্রজাদের মতো?”

“নিজেই চিন্তা ক’রে দেখ। তবে নারী সত্যিকার অর্থে মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে। সে বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু এখনও বলার সময় আসেনি কিভাবে তা সম্ভব। আমাদেরকে আরো রহস্য ঘাটতে হবে।”

“আবারও কি আমরা গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ব?”

“তা তো বটেই।”

“তাহলে আর দেরি কেন, বিরূদা?”

“বছর দুই আগে এক লোক এসে হা-পিত্যেশ জুড়ে দিলেন, ‘প্রফেসর সাহেব, কিছু একটা করেন। খুব সমস্যায় আছি।”

‘পারিবারিক সমস্যা?’

‘জী না, দাম্পত্য সমস্যা। আমার মতে অধিকাংশ দাম্পত্য সমস্যাই পারিবারিক সমস্যা নয়। এবং অধিকাংশ পারিবারিক সমস্যাই দাম্পত্য সমস্যা থেকে উদ্ভূত।’

‘আপনার সাথে আমার মতের অন্তত এই ব্যাপারটাকে চমৎকার মিল আছে। তো আপনার সমস্যাটা কী?’

‘সে অনেক কথা। অনেক গল্প বলতে হবে। অনেক দৃষ্টান্ত দিতে হবে।’

‘বেশ তো। সব বলুন।’

‘কিন্তু কোনো কোনো ঘটনা এত ছোট এবং তুচ্ছ যে তা বললে আপনি হেসে ফেলবেন এই ভেবে যে এত মামুলি ঘটনায় আমি এত বড় বড় কষ্ট পেয়েছি। আমার স্ত্রীর ছোট ছোট আচরণ তিলে তিলে আমাকে টুকরো টুকরো ক’রে দিচ্ছে। আমার সবচেয়ে বড় কষ্ট এটাই যে আমার নালিশ শোনার মতো কেউ নেই। তাছাড়া ছোট ছোট ঘটনাকে কাউকে না যায় বলা, না যায় বুঝানো। বলতে গেলে তার গুরুত্ব হারিয়ে যায়। ভাবতে গেলে তার কোনো কাঠামো খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি আপনাকে কী বলব? কোত্থেকে শুরু করব? কোথায় শেষ করব?’

‘আপনি তো ইতিমধ্যেই চমৎকারভাবে আপনার সমস্যার কথাটা ব’লে ফেলেছেন। এমন ক’রে আমিও বলতে পারতাম না। দেখুন ভাই, মানুষ এতই হতভাগা যে ছোট ছোট ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য তাকে বড় বড় তত্ত্ব উদ্ভাবন করতে হয়। সুতরাং আমার চিন্তায় আপনার ছোট ঘটনাগুলো আদৌ ছোট নয়।’

‘আমার ভালো লাগছে যে আপনি আমাকে বুঝতে পেরেছেন।’

‘আচ্ছা, আপনি যে বললেন এমন কেউ আপনার নেই যার কাছে আপনি নালিশ করবেন। কে নেই আপনার?’

‘কে নেই তা বলার চেয়ে কে আছে তা বলা আমার জন্য বেশি সহজ। আমার শ্বশুর আছে, শ্বাশুড়ি আছে। তাদের মেয়ের ব্যাপারে তাদের কাছে নালিশ করতে পারলেই তো সব চেয়ে ভালো হতো, নয় কি?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। চমৎকার বলছেন।’

‘প্রফেসর সাহেব। আমারও একটা মেয়ে আছে। আমি তাকে এমনভাবে মানুষ করেছি যেন একটা ছেলেকে চমৎকার একটা স্ত্রী কিংবা জীবনসঙ্গিনী উপহার দিতে পারি। এক জনের ঘর যদি আলোকিত ক’রে না দিতে পারলাম, তাহলে বাবা হিসেবে আমার সার্থকতা কোথায় থাকল? আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি তাদের মেয়েদেরকে সেই মহৎ চিন্তা মাথায় নিয়ে কোনো দিনই গ’ড়ে তোলেননি। শুধু তাই নয়, আমার মেয়েকে বিয়ে দেয়ার পর তার শ্বশুর বাড়ি গিয়ে আমি তাদের কাছে প্রথমেই জানতে চাইব আমার মেয়ের বিরুদ্ধে তাদের কোনো অভিযোগ আছে কি না। সেটাই তো উচিত। আমার মেয়ের মধ্যে যদি অত্যাচারী ভাব কিছুটা থাকেও, কিংবা পরিস্থিতির ফেরে তার মধ্যে তা গ’ড়ে ওঠেও, তবুও আমার নৈতিক ঘৃণা এবং প্রতিবাদ তাকে নৈতিকভাবে দুর্বল ক’রে দেবে। তার পর সে যতই যা করুক, একটা সীমার বাইরে কখনও যাবে না। আমি পক্ষ নেব আমার জামাইয়ের, এবং আমার মেয়ের পক্ষ নেবে তার শ্বশুর-শাশুড়ি, এটাই তো উচিত, তাই না প্রফেসর সাহেব?’

‘অদ্ভূত! বলুন, বলতে থাকুন। ’

‘আমরা মা-বাবা হয়ে গেলে এত ভোঁতা এবং স্বার্থপর হয়ে যাই যে মেয়েকে বিয়ে দেয়ার পরই তার ওপর থেকে আমরা সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাই ব’লে মনে করি। কি বিস্ময়কর আমাদের স্বার্থপরতা। মেয়ে বিয়ে দিতে না পারলে আমরা সমাজ থেকে সহানুভূতি পাই—আমাদেরকে ‘কন্যা-দায়গ্রস্ত’ পিতা ব’লে আদর করা হয়। অথচ বিবাহিত মেয়ের স্বভাবগত অসার্থকতা এবং অসম্পূর্ণতার কারণে আমাদেরকে সামাজিকভাবে মুখে চুনকালি লাগানো হয় না। আমরা তখন যত দোষ চাপাই মেয়ের এবং তার স্বামীর ঘাড়ে। আমাদের বুদ্ধিজীবীরাও এই প্রথাকে চালু রাখেন। এটাই তো নারী-নির্যাতন এবং নারী-অবমাননা সমাজে টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে শক্তিশালী কালো প্রথা। আমরা কি এই প্রথা ভাঙতে পারি না? মেয়ের বিরুদ্ধে নালিশ শুনতে হলে আমাদের সম্মানে লাগে, মুখ ধুলো হয়ে যায়। তাহলে জন্ম দেয়ার সময়েও তো সম্মানে লাগা উচিত ছিল। জন্মের গাল দিলে মানুষ লজ্জা পায়, কিন্তু বাবা-মায়ের সাথে সন্তান যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন ঐ সন্তানকে দেখে কি মানুষ অনুমান করতে পারে না তারা তাকে জন্ম দেয়ার সময়ে গোপনে অন্ধকার ঘরে কী কী করেছিল? সন্তান মানুষ করার ভালো পদ্ধতি যাদের জানা নেই, তাদের জন্য সন্তানের জন্মদান নিষিদ্ধ হয় না কেন? মেয়ের বা ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ করতে গেলে বাবা-মারা হীনমন্যতায় ভোগে কেন? ছেলে-মেয়ের অসার্থকতার বা অসম্পূর্ণতার অভিযোগ

শুনতে হলে অপরাধবোধ এবং এড়িয়ে-যাওয়া স্বভাব দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা আত্ম-সম্মান রক্ষা করার জন্য ক্ষেপে ওঠে কেন? কাপড়ের তলে তো আমরা সবাই ন্যাংটো, সবাই তা জানিও, তাই ব'লে কি লজ্জা পেতে হবে নাকি?'

'সম্ভবত আপনার কষ্টটাকে আমি এবার আরেকটু ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি।'

'তবুও আমি কোনো স্পষ্ট উদাহরণ দিতে চাই না। আমি শুধু এটুকু বলব যে আমার স্ত্রী আমাকে যত আদর করে, পৃথিবীর খুব কম স্ত্রী তাদের স্বামীকে অত আদর করে।'

'কিভাবে?'

'আমার বেশ-ভূষা, খাওয়া-দাওয়া, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি ব্যাপারে সে ডাক্তারকেও হার মানায়। নিজে মাছের মাথাটা না কেয়ে আমাকে খাওয়ায়।'

'তাতে আপনারই তো লাভ হচ্ছে। তবে তার উদ্দেশ্য?'

'যেন আমি ম'রে না যাই।'

'মানে?'

'হাতের কাছে ছুরি, তড়ি, কাঁচি এসবও রাখে না।'

'কারণ?'

'যেন আমি আত্মহত্যা না করতে পারি।'

'ভালোই তো।'

'হ্যাঁ। সে চায় না আমি এক সাথে মরি কিংবা নিজের কায়দায় মরি। সে আমাকে একটু একটু ক'রে নিজের হাতে মারতে চায়।'

'মাই গড!'

'আমি মনে করি আত্মহত্যার অধিকার একটা মৌলিক অধিকার। ধুকে ধুকে মারার কোনো অধিকার কারো থাকা উচিত না। অবশ্য মৃত্যুর জঘন্যতম পন্থা এটা নয়। সবচেয়ে কঠিন শাস্তি এর চেয়ে আরেকটু আলাদা।'

'তার মানে আপনার মতে মৃত্যুদণ্ড কঠিনতম শাস্তি নয়?'

'না। কঠিনতম শাস্তি হচ্ছে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা, হত্যা করা নয়। এই শাস্তি পাওয়া উচিত পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষদের। সক্রেটিসকে এই শাস্তি দেয়া হয়েছিল। নিকৃষ্টদের বিচারে এরূপ বিচারের প্রবর্তন করা দরকার। অবশ্য আত্মহত্যা আর বাধ্যতামূলক আত্মহত্যা এক নয়। প্রথমটা হলো দ্বিতীয়টা থেকে মুক্তির উপায়।'

'আপনি তো চমৎকার কথা বলেন। ওকালতি করেন নাকি?'

'তাহলে তো ভালো হতো। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতাম। নিজের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মাত না।'

'যাহোক, এখন আপনাকে কী সমাধান দিতে পারি?'

'শুধু একটু প্রবোধ দিতে পারেন। আর সম্ভব হলে আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে এ ব্যাপারে একটু সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য পরামর্শ দিতে পারেন।'

'আমি অবশ্যই তা করব। আপনার যে সমস্যা, তার সমাধান করতে পারেন কেবল তাঁরাই।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'তার চেয়ে বেশি ধন্যবাদ আপনারই প্রাপ্য। আপনি আমাকে একটা নোতুন সত্য শিখালেন। আপনার কথা আমি কোনোদিন ভুলব না। আমি আমার দায়িত্ব পালন করব। আপনার শ্বশুড়-শাশুড়ি যদি মানুষ হয়ে থাকেন, তাহেল তারাই এর সমাধান করবেন। পশুর কাছ থেকে সঠিক এবং মনস্তত্ত্ব-গর্ভ আচরণ আশা করা যায় না।"

গল্পটা শুনে আমি থ হয়ে গেলাম। বললাম, "বিরূদা, এত কঠিন কথা তো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।"

"ও, সরি," বিরূদা বললেন, "হঠাৎ ক'রে মনে পড়ল। তাই ব'লে ফেললাম। অবশ্য ভদ্রলোকের জীবনে সুখ ফিরে এসেছিল।"

"কিভাবে?"

"তার শ্বশুড়-শাশুড়ির হস্তক্ষেপে।"

"ওহ, নাইস!"

"তাদেরকে পুরষ্কৃত করা উচিত।"

"আসলে!"

"যাহোক, সব কিছু স্বাভাবিক হবার পরও ভদ্রলোকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা রয়ে গেছে। ওটাই তাদের একান্ত ঘনিষ্ঠতার পথে একটা বাধা হয়ে আছে। অবশ্য তা তেমন কোনো সমস্যা নয়।"

"তবুও বলেন না, শুনি।"

"মাস দুয়েক আগে তার স্ত্রী আমার কাছে এসেছিলেন। পরিচয় পেয়েই চিনতে পেরেছিলাম। অবশ্য তাদের অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি করিনি।"

"কী অভিযোগ ছিল তার?"

"একটা চমৎকার অভিযোগ। এসেই বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমি আমার স্বামীকে আপনার কাছে পাঠাব। ওকে আপনি একটু ভালো মতো চিকিৎসা করবেন।'

আমি বললাম, 'কেন, কী হয়েছে তার?'

'ওর পেটে মারাত্মক অসুখ হচ্ছে।'

'তাহলে তো অন্য ধরনের ডাক্তার লাগবে।'

'কিন্তু রোগটা হচ্ছে তো খাওয়ার দোষে।'

‘কেন, কী খান উনি?’

‘লিপস্টিক।’

‘লিপস্টিক? আপনার স্বামী লিপস্টিক খান?’

‘অমন ক’রে বলছেন কেন? একটু আস্তে বলেন। মাসে তিন তিনটা লিপস্টিক লাগে আমার।’

‘ও, আচ্ছা। তাহলে ঠোঁটে আর লিপস্টিক না লাগালেই হলো।’

‘কিন্তু লাগাই কি আর সাধে? লিপস্টিক ছাড়া যে ও আর খেতেই চায় না।’

‘ও, এবার বুঝেছি। ভেবেছিলাম দোষটা আপনার ঠোঁটের। কিন্তু আপনার ঠোঁটের জন্য কোনো ওষুধ দেব না। তবে তার ঠোঁটের জন্য একটা ওষুধ দিতে পারি।’

‘কী ওষুধ?’

‘লিপস্টিক।’

‘মানে?’

‘এখন থেকে ঘনিষ্ট হবার আগে ওনার ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে দেবেন এবং আপনার ঠোঁট দুটোকে সাদা রাখবেন।’

‘তাহলে তো তা আমারই পেটে যাবে।’

‘না। তার ঠোঁটের জিনিস তার পেটেই যাবে। প্রথম কয়েক মিনিট পুরুষ একাই সব খেয়ে সাবাড় করে।’

‘তা ঠিক। কিন্তু তাতেও তো ফল একই হবে।’

‘শুনুন। উনি আপনার ওপর কোনো অতীত যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিচ্ছেন। হয়তো অতীতে আপনি তার সাথে এমন আচরণ করেছেন যা থেকে তাঁর মনে এমন ধারণা এবং বিতৃষ্ঞা জন্মেছে যে আপনি কোনো নারী নন, নারীর কায়ায় পুরুষ। ফলে আপনাকে দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কাজ তখনই সম্ভব যখন তিনি আপনাকে রং-মাখানো

টসটসে ভোগ্যবস্তু হিসেবে কাছে পান। এটা হলো তার প্রতিশোধ। তাই আপনি দৃশ্যে-গন্ধে পুরোপুরি মেয়েলিপনা না করলে তিনি আপনাকে সহজে গ্রহণ করতে পারেন না। এ কারণেই লিপস্টিকের দরকার হচ্ছে। কিন্তু আপনি নারী না সেজেও যদি নারী রয়ে যেতে পারেন, তাহলে তিনি আপনার ওপর থেকে তাঁর প্রতিহিংসা তুলে নেবেন। অবশ্য তার জন্য প্রতীকী অনুষ্ঠানের মতো তাকে নারী সাজিয়ে তার মধ্যে সত্যিকারের বিদ্রোহী পুরুষটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। কয়েক দিন এরকম করলে আর লিপস্টিকের দরকার হবে না। তবে ব্যাপারটাকে অভ্যাসে পরিণত হতে দেবেন না। তাহলে আপনি আবার পুরুষালি বৈশিষ্ট্য ফিরে পেতে শুরু করবেন। মনে রাখবেন, অনেক নারী তাদের স্বামীদেরকে মেকি মহিলার মতো নির্জীব ক'রে ঘরের মধ্যে পুষে রাখতে চায়। তার ফলে তারা পুরুষটাকে হারায়। অথচ তাদের জন্য দরকার খাঁটি পুরুষ। ফলে সেই পুরুষরূপী নারীর মধ্যে তারা আবার একটা সুপুরুষকে খোঁজে। কিন্তু না পেয়ে নিজেরাই পুরুষের ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। দাম্পত্য জীবনে দেখা দেয় অসঙ্গতি। তা ছড়িয়ে পড়ে সংসারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সমাজে, গোটা সভ্যতায়। তখন সব দোষ বর্তায় পুরুষের ঘাড়ে। দেখুন, নারীর মতো নারী হওয়া আর পুরুষের অধীন শয্যা-দাসী হওয়া এক কথা নয়। *আপনি তাকে পেতে চান পুরুষ হিসেবে, আবার তাঁকে পুরুষ হিসেবে বাঁচতে দেবেন না, তা কী ক'রে হয়?* পুরুষকে সত্যিকারের পুরুষ ক'রে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব নারীর ওপরেও বর্তায়। কারণ নারীর জন্য সত্যিকারের পুরুষই দরকার। *পুরুষের পুরুষত্বকে আঘাত করবেন না, দেখবেন সেও আপনাকে আর শেকলে বেঁধে রাখছে না।* মহিলাদের মধ্যে অনেকে এত মারাত্মকও আছে যে, তারা যদি মায়ের জাতি না হতো, তাহলে ঐ সামান্য কিছু মহিলার ভুলের কারণে গোটা নারী-সমাজই পুরুষের কাছে সব মানবীয় গুরুত্ব হারাত। এটা নারীর সৌভাগ্য যে, বাবা যতই প্রতিশোধ-পরায়ন হোক না কেন, ছেলে মাকে বাঁচিয়ে রাখে। এটা নারীর সৌভাগ্যমাত্র, কৃতিত্ব নয়।'

'আপনি আসলে সত্য কথা বলেছেন। কিন্তু আমার অতীতকে আপনি জানলেন কিভাবে?'

'বর্তমান দেখে। অধিকাংশ বর্তমানই তার অতীতের সাক্ষ্য বহন করে। তবে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং অতীত যদি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে তার উচিত তা অস্বীকার করা এবং এভাবে বর্তমানকে অতীত থেকে পুরোপুরি ছিন্ন ক'রে নেয়া। দেখুন, মানুষকে যদি কোনো অলৌকিক কায়দায় তার ইতিহাসকে পুরোপুরি ভুলিয়ে

দেয়া যেত, তাহলে তার ভবিষ্যতটা অন্য ধরনের হতো, বিবর্তনের ধারায় অতীত তার জৈবিক সত্তার মধ্যে যতখানিই বর্তমান থাকুক না কেন। কলংক কেবল ইতিহাসেই মানায়। ইতিহাস থেকে তাকে বর্তমানে উঠে আসতেই যদি দিলাম, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন?'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ আপনার স্বামীকে।'

'কেন?'

'কারণ লিপস্টিকের কারণে হোক আর অন্য কারণেই হোক, খাচ্ছেন তো।'

মহিলা হেসে উঠলেন। 'আর আমাকে?'

'আপনাকেও। কারণ খাওয়ানোর জন্য কষ্ট ক'রে হলেও আপনি লিপস্টিকের ব্যবস্থা করছেন।'

ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে চলে গেলেন।"

অনেক গল্প হয়েছে। এবার বিরূদা প্রস্তাব করলেন, "চল, রাজন, একটু হেঁটে আসি।" কোথায় যাওয়া যায় স্থির করতে না পেরে তিনি বললেন, "চল দোকানে যাই।" অর্থাৎ এলিফ্যান্ট রোডে তার জুতোর দোকানে। ওখানে গিয়ে বেচাকেনার হালচাল দেখে আমরা আজিজ সুপার মার্কেটে যাব। বিরূদা দুয়েকটা বই ঘাটাঘাটি করবেন। কিনতেও পারেন।

আমরা প্রথমে গেলাম দোকনে। রিক্সা নিলাম না। হেঁটেই গিলাম। বিরূদার হাঁটার গতি দেখে অনুমান করতে পারলাম যে তিনি জরুরী কাজে ছাড়া রিক্সায় বা বেবিতে কোথাও যান না। আমি তাঁর সাথে হেঁটে তাল রাখতে পারছিলাম না। "আমি সপ্তাহে কমপক্ষে তিন দিন হাঁটি," বললেন তিনি, "সেই তুলনায় তোমাদের মতো যুবকদের হাঁটা উচিত সাত দিন।" আমি বললাম, "তা ঠিক, কারণ সপ্তায় তো আট দিন হাঁটা সম্ভব না।"

দোকানে গিয়ে আমরা মিনিট দশেক বা তার সামান্য কিছু বেশি সময় থাকলাম। কিন্তু তার মধ্যেই একটা মজার ঘটনা ঘটে গেল। এক বয়স্কা মহিলা তার মেয়ের সাথে এসেছেন জুতো কিনতে। কিন্তু তার ডান পায়ে ব্যথা। জুতো ট্রাই করার সময়ে সেলস্‌ম্যান ডান পায়ে যেই একটা জুতো খাটিয়ে দিতে চাইল, অমনি তিনি প্রথমে একটু ককিয়ে উঠে সহসা হাসতে শুরু করলেন। টনটনে ফোঁড়ায় আলতোভাবে হাত দিলে অনেকে যেমন ক'রে থাকে। সেলস্‌ম্যান তাকে জিজ্ঞাসা করল তার কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না। জবাবে তিনি বললেন যে তার ডান পায়ে ব্যথা। কিছু দিন আগে সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে চোট লেগেছিল। বিরূদা আরেক জন সেলস্‌ম্যানকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন তিনি হাসছেন কেন। কাঁদতে সমস্যা কোথায়।

জবাব এল, "কষ্টে পড়লে কি মানুষ কাঁদে বাবা, কষ্টে পড়লে তো হাসে।"

একথা ব'লেই তিনি ব্যথায় ককিয়ে হাসতে লাগলেন। যন্ত্রণাদায়কভাবে সুড়সুড়ি দিলে মানুষ যেমন হাসে, এ হাসি সেই জাতের। বিরূদার কথামতো সেলসম্যান তাকে আবারও প্রশ্ন করল তিনি এখন আর কষ্ট পেয়ে কাঁদেন কি না। জবাবে তিনি বললেন, "কাঁদব না কেন, বাবা। কাঁদি। একটা বয়সের পর মানুষ আর পাওয়ার জন্য কাঁদতে পারে না, কেবল হারাবার জন্য কাঁদে। এখন আঘাত পাওয়ার জন্য কাঁদা সম্ভব নয়। তবে প্রিয়জন হারানোর সংবাদ শুনলে কাঁদতেই হবে।"

বিরূদা সেলসম্যানকে আবারও জিজ্ঞাসা করতে বললেন এই বয়সে না কাঁদতে পারার আর কোনো কারণ আছে কি না তা জানার জন্য। বিরূদার দুষ্টুমিপূর্ণ কৌশল দেখে আমার হাসি আসছিল সবচেয়ে বেশি।

"আসল কথা হলো, চোখে পানি আসে না। চোখে পানি ছাড়া কাঁদতে শরম করে।"

বৃদ্ধার কথা শুনে সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠল। তাঁর মেয়েও। বিরূদা মুচকি হাসলেন। তিনি আরো যোগ করলেন, "কান্না একটা কুৎসিত কাজ। দ্যাখ না, কেউ কাঁদতে লাগলে তার মুখটা কেমন বেঁকে যায়? এ কারণে মানুষ সবার সামনে হাক-ডাক ক'রে দুঃখ প্রকাশ করলেও কাঁদে গিয়ে নিরালায়। হাউমাউ ক'রে কাঁদতে পছন্দ করে কেবল রাজনীতিকরা। কান্নার সাথে যদি চোখের পানি না থাকত, তাহলে মেয়েরা কখনও কাঁদত না। মুখ একটু বেঁকে গেলেও কান্নারত মেয়েদের চোখের পানি

হয় খুব আকর্ষনীয়। আর সুন্দরী মেয়েদের জন্য তো কান্নার কোনো বিকল্পই নেই। সুন্দর দেখাবে ব'লে পুরুষ অনেক সময়ে তাদেরকে ইচ্ছে ক'রেই কাঁদায়। তাছাড়া বয়েস কালে কান্নার মধ্যে মুখ বেঁকে যাওয়াকেও থামিয়ে রাখার যোগ্যতা থাকে। ইদানিংকালের নাটক সিনেমার নায়িকাদের কান্না দেকলে বুঝা যায় যে কান্নাও একটা আর্ট। আধুনিকা সুন্দরী মেয়েরা কান্নার মধ্যেও ঠোঁট-দুটোর বেঁকে যাওয়া কিভাবে থামাতে হয় এবং তাকে কিভাবে হাসির চেয়েও মধুর ক'রে তুলতে হয় তা জানে। কিন্তু বাবা, আর্ট হলো একটা কৃত্রিম ব্যাপার। বুড়ো বয়সে তাকে আর অভ্যাসের মধ্যে ধ'রে রাখা যায় না। আমি মন খুলে কাঁদব, এদিকে আবার তারই মধ্যে মুখটাকে বিশেষ আকৃতি দিব, তা কি শিশুদের এবং বয়স্কদের দ্বারা সম্ভব? এজন্য বয়স্কদের কান্না দেখতে ঠিক সেই আদিযুগের মানুষদের আহাজারির মতো। সে কান্না বাইরে শোভা পায় না। কাঁদব না কেন, কাঁদি। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী এদের সামনে কাঁদি।"

"আচ্ছা মা, এখন থামাও তো তোমার লেকচার। এদের বেচা-কেনায় ক্ষতি ক'রো না," হাসতে হাসতে তাঁর মেয়ে তাঁকে ধমক দিল। বিরূদা তাদের কাছ থেকে জুতোর দাম অনেক কম রাখলেন। পরিচয় পাওয়া গেল, ভদ্রমহিলা এক সময়ে কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। এখন লেখালেখিও করেন, তবে প্রকাশ করেন না। আগের যুগের সুশিক্ষিত এবং স্বশিক্ষিত একজন নারী। বিরূদা তাঁকে তাঁর ঠিকানা দিয়ে এক দিন সপরিবারে বাসায় আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি খুশি হয়ে বিরূদাকেও সার্বক্ষণিক আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন।

আমরা দোকান থেকে বের হলাম। উদ্দেশ্য শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেটের বইপাড়ায় যাওয়া। বিরূদা বললেন, "হেঁটে যাব। খিদেটা বাড়ানো দরকার। ওখানে যেয়ে কিছু খেয়ে নেয়া যাবে।"

হালকা খাবার খেতে খেতে বিরূদা একটু আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, "বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে অতগুলো প্রশ্ন করতে বলেছিলাম কেন তা কি এখন বুঝতে পেরেছ, রাজন?"

"জ্বী, বিরূদা, বুঝেছি। প্রশ্নগুলো না করলে অত সুন্দর কথাগুলো শোনা যেত না।"

“কিন্তু আরেকটা কারণ ছিল।”

“কি কারণ?”

“তার ব্যথা পেয়ে হাসার ঘটনা দেখে আমার ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে গিয়েছিল। সেখানেও ব্যথা এবং কান্নার একই মিল ছিল, কিন্তু কারণ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।”

“তাহলে তো ঘটনাটা না শোনা অসম্ভব।”

“আমার বয়স তখন বার কি তের। আমার বড় বোনের বয়স সবেমাত্র চৌদ্দ পার হয়েছে। তার বিয়ে ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে। সেদিন বরপক্ষ তাকে আংটি আর চুরি পরাতে এসেছিল। তারা ছিল বেশ অবস্থাসম্পন্ন লোক। মেয়ে দেখে তারা এত খুশি যে মেয়েকে খুশি করার জন্য বিয়ের আগেই তাকে তারা ভালো উপহার দিতে চান। অবশ্য তারা আমার মা-বাবাকেও সুন্দর উপহার দিয়েছিল এবং আমার মা-বাবাও তাদেরকে সকৃতজ্ঞ প্রতিদান দিয়েছিলেন। সামাজিক সম্পর্ককে মধুরভাবে পারিবারিক সম্পর্কের পর্যায়ে আনতে হলে এসব করা দরকার। যাহোক, চুরি দুটো সবার উপস্থিতিতে পরিয়ে দিচ্ছিলেন আমার বোনের হবু দাদী শাশুড়ি। কিন্তু আমার বোনটা ছিল একটু মোটা-সোটা। চুরি দুটো তার হাতে আর সহজে ঢুকতে চায় না। শুরু হলো চাপাচাপি, চেঁচামেচি। একটু একটু ক'রে তার হাতের মধ্যে চুরি ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে, আর একটু একটু ক'রে তার ব্যথা বাড়ছে, এবং ক্রমে ক্রমে সে আরো জোরে হাসছে। ব্যাপারটা সবাইকে হাসাল। কিন্তু খুশির ঘটনায় সে হাসিটা ছিল স্বাভাবিক।

অনুষ্ঠান-পর্ব শেষে বরপক্ষ চ'লে গেলে আমি আমার বোনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘বুবু, তুই ব্যথা পেয়ে ওভাবে হাসছিলি কেন? ব্যথা পেয়ে কি কেউ হাসে?’

‘দূর হ, বোকা,’ জবাব দিল সে, ‘ওসব তুই বুঝবি না।’

‘হাসি-কান্না আমি বুঝব না? না বললে আমি কিন্তু তোকে খেপাব।’

গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে সে বলল, ‘আসল ঘটনা কী জানিস? আমার চোখে ছিল কাজল। কাঁদলে সারা মুখে কাজল লেপটে যেত।’”

বিরূদার গল্প শুনে এক সাথে দুই জাতের হাসি হাসলাম।

বিরূদা বললেন, "আজ আর বই ঘাটাঘাটি হবে না। চল বাসায় যাই। লিপস্টিক-খাওয়া লোকটার জীবনের কষ্টের কথা মনে করতে করতে একটা মজার ঘটনা মনে পড়েছে। একবার এক লোক এসে তার মতোই ছটফট শুরু ক'রে দিলেন। কিন্তু খানিক দাপাদাপি করার পর বললেন, 'গাধার খাটুনি খাটছি। শুধু মন যুগিয়ে চলতে হচ্ছে। সংসারে আমার আর কোনো মূল্য নেই। বিছানায় আমি খেলার পুতুল। প্রখর কামনা ছিল আগে। এখন তাও অন্যান্য বিতৃষ্ণার কারণে মরে গেছে। অবশ্য আমি আপনার কাছে কোনো উপদেশ নিতে আসিনি। আমার যন্ত্রণার সারাংশ পাবেন এই কাগজটাতে।' এই ব'লে তিনি একটা কাগজ আমার হাতে দিয়ে গেলেন। তাতে তার জীবনকে ছোট একটা রূপক ঘটনায় সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। চল, তোমাকে ওটা দেব।"

আমি কাগজটা নিয়ে বাসায় ফিরে গেলাম। রাতে কাগজটাকে হাতে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। লেখাটা ঝরঝরে। সুখপাঠ্য। এবং সংক্ষিপ্ত:

"গোধূলি বেলা। আমি মাঠের মধ্যে একা। আমার চোখে নেশা। খুঁজছি। পেছন থেকে এক জন আমাকে প্রশ্ন করল, 'কী খুঁজছ?'

আমার পড়শি। এবং বন্ধু। তারও অবস্থা আমার মতো। বললাম, 'হারানো জিনিস।'

'কোথায় হারিয়েছ?'

'এখানে কোথাও।'

'কই, আমি তো দেখছি না।'

'কী দেখছো না?'

'তোমার যা হারিয়েছ।'

'কী হারিয়েছে আমার?'

'তা তুমিই জান।'

‘পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি জানতে পারছি না কী হারিয়েছে।’

‘কিন্তু পাচ্ছি না তো।’

‘আমিও না।’

‘তুমি এক কাজ কর। মনে ক’রে দেখ কী হারিয়েছ।’

‘মনে করতে পারছি না ব’লেই তো খুঁজছি।’

‘তার মানে মনে পড়ার জন্য খুঁজছ?’

‘চুপ ক’রে থাক।’

‘আচ্ছা।’

‘খালি হারিয়েই যাচ্ছে। তাই ভাবলাম আরেকটু চেষ্টা ক’রে দেখি।’

‘বেশ তো। কী হারাচ্ছি তা না জেনে তাকে পুরোপুরি হারিয়ে যেতে দেয়া ঠিক নয়। তুমি আসল জিনিসটাই বুঝেছ।’

‘ছাই বুঝেছি।’

‘কী বললে?’

‘ঠিক বলেছি। ছাই।’

‘মানে তুমি ছাই হারিয়েছিলে?’

‘বেটা গবেট, তাই তো বললাম।’

‘হারাও।’

‘হারাও মানে?’

‘মানে হারাও। আরো হারাও। হারাও এবং ভুলেও যাও। ছাই হারিয়ে তা আবার মনে রাখার দরকারটা দরকারটা কী? ছাই যত হারাবে তত মঙ্গল।’

‘মঙ্গল?’

‘হ্যাঁ।’

‘গর্দভ! ঐ ছাইয়ের মধ্যে রত্ন ছিল তা জান?’

‘তাই নাকি? তা রত্নগুলো কোথায় পড়েছে?’

‘উড়ে গেছে।’

‘রত্ন উড়ে গেছে!’

‘ছাই উড়ে গেছে।’

‘ছাই তো উড়বেই।’

‘সে জন্যই তো খুঁজছি।’

‘কিভাবে উড়ল?’

‘উড়িয়ে দিয়েছিলাম। শোনোনি—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়ায়ে দেখিবে ভাই, পেলেও পাইতে পার অরূপ রতন? তাই ছাই ওড়ালাম। রত্ন তো পেলাম না, ছাইটুকুও গেল। এখন গিন্নী ছাই খুঁজতে পাঠিয়েছে। তা না হলে রাতে ভাত নেই।’

‘ছাই দিয়ে তার কী দরকার?’

‘ওড়াবে। তার মানে সে নিজের হাতেই ওড়াবে। বুঝলে? রত্ন চায়, রত্ন।’

‘তাই বল। ভেবেছিলাম দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাও কি না। প্রতিবেশীর ঘাড়ে তো সহজে দোষ চাপানো যায়। আমি কিন্তু কোনো রত্ন-টত্ন পাইনি।’

‘মানে?’

‘আমি শুধু ছাইটুকু নিয়েছিলাম। আমার গিন্নী ওড়াবে। আমার ওড়ানোর ওপর তার আস্থা নেই।”

সেই রাতে স্বপ্ন দেখলাম। লাল গোধূলি। দিগন্ত-জোড়া পৃথিবী। অদ্ভুত রঙিন বাতাসে মোনালিসার মতো স্মিতহাস্যে দাঁড়িয়ে থেকে রিভা তার হলুদ ওড়না উড়িয়ে দিল। তারপর বেগবান নদীর মতো বাতাসের ওপর ভর ক'রে ছুটে এল আমার কাছে। বঙ্ক-ভঙ্গিমায় ঘূর্ণিবাত্যার মতো আমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। নৃত্য-চঞ্চল আঙুলে আমার প্রগাঢ় আবেগে দিল ছুঁয়ে। অমনি আমি কয়েক মুঠো মসৃণ ছাই হয়ে বাতাসের ধাক্কায় আকাশে বিলীন হয়ে গেলাম।

অতচ তার পরও মনে হলো আমি আছি। কোথাও যেন খানিকটা রয়ে গেছি। এবং সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমারই একটা ছায়া রিভার পিছে পিছে নির্বিকারে হেঁটে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী লোকালয়ের দিকে।

১

পরদনি যথাসময়ে বিরূদার কাছে গিয়ে দেখি তিনি পোশাকাদি প'রে সেজে-গুজে ব'সে আছেন। জানতে চাইলাম, "কোথাও যাচ্ছেন, বিরূদা?" তিনি এক গাল ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, "ইচ্ছে তো ছিল।"

"তাহলে আজ আমি বরং ফিরে যাই। আপনার সময় নষ্ট করব না।"

"তুমিও যাচ্ছ আমার সাথে।"

"আমিও?"

"তুমি তা নিজেই জান না?"

"ব্যাপারটা কী বলুন তো বিরূদা?"

"হো, হো, দাওয়াত পেয়েছি, বুঝলে, দাওয়াত। বস, চা খেয়ে উঠে পড়া যাক।"

বিরূদাকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "দাওয়াত খেতে যাব, অথচ কিসের দাওয়াত তা আগে থেকে জানতে পারবে না, এ কেমন দুর্ভাগ্য।"

"বরং বল এটা সৌভাগ্য।" তারপর গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার ভঙ্গি ক'রে তিনি বললেন, "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াত, রাজন। ফরিদা আপা ইনভাইট করেছেন।"

"ফরিদা আপা? মানে আপনার সেই বড় বোন?"

"আরে না। ঐ কেন মনে নেই, গতকাল যে ভদ্রমহিলা জুতো কিনতে এসেছিলেন। ব্যথা পেয়ে...."

"ও বুঝেছি। তাহলে তো চমৎকার হবে। নোতুন নোতুন কথা শুনা যাবে। কিন্তু ওনার সাথে যোগযোগ হলো কিভাবে?"

“সকালে ফোন করেছিলাম। দাওয়াত চাইতেই উনি দিয়ে দিলেন। আজ সন্ধ্যায়। শুধু তাই নয়, তাঁকে আমি আমার উদ্দেশ্যের কথাও বলেছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম যে আমি নারী মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন ব’লে আমার বিশ্বাস। শুনে উনি প্রথমে কিছুটা গুম্ হয়ে গেলেন। তারপর খুশিতে আপ্লুত হয়ে বললেন, ‘আপনি আমার উপকার করলেন।’

আমি জানতে চাইলাম, ‘কিভাবে?’

উনি বললেন, ‘ঠিক আমিও একই জাতীয় বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি। তা নিয়ে লেখালেখিও করছি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আপনার জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত হলে তা সমাজের কাজে লাগবে। আমি আপনাকে আমার অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপারে যতদূর সম্ভব খুলে বলতে কুণ্ঠা বোধ করব না।’

ফরিদা আপার আশ্বাসবাণী পেয়ে আমি তো হাতে চাঁদ পেলাম।

“মনে হচ্ছে আমরা খুব সৌভাগ্যবান। কী বলেন বিরূদা?”

“নিঃসন্দেহে!”

এমন সময়ে টেলিফোন এল। ফরিদা আপা। তিনি বিরূদার জন্য হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন, “প্রফেসর সাহেব, আপনি আমার এখানে আসবেন কি না তা আরেক বার ভেবে দ্যাখেন। অবশ্য আমি দাওয়াত ফিরিয়ে নিচ্ছি না।” এই ব’লেই তিনি রিসিভার রেখে দিলেন।

বিরূদা চিন্তায় প’ড়ে গেলেন। তিনি কোথায় যেন একটা রহস্যের গন্ধ পেলেন। বিড় বিড় ক’রে বললেন, “আমিও দাওয়াত ফিরিয়ে দিচ্ছি না।” তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি যখন কোনো রহস্যের গন্ধ পান, তখন তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি যেন ক্ষুধার্ত অবস্থায় বারান্দায় ব’সে রান্নাঘরের পোলাওয়ের গন্ধ পাচ্ছেন। তিনি কাত হয়ে ব’সে চিকচিকে গোঁফের তোড়ায় আঙুল পালিশ করতে করতে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। মুখে মৃদু হাসি। সে হাসি কতকটা শয়তানিপূর্ণ মিটমিটে হাসির মতো। বিরূদার এই হাসির ব্যাপারে মন্তব্য না ক’রে থাকতে পারলাম না, “আপনি কি হাসছেন, বিরূদা?”

“আরে পাগল,” গোপন হাসিটাকে ধ্বনিতে সমর্পণ ক’রে তিনি ব’লে উঠলেন, “হাসলে যদি কাউকে ভিলেনের মতো না দেখায়, তাহলে বুঝতে হবে যে তার হাসির পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই।”

বিরূদার কথা শুনে বিস্ময়ে কিছুটা ভড়কে গেলাম। উনি আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্যটাও বুঝে ফেলেছেন! লোকটার কথাগুলো কোনো ভালো শ্রোতাকে চমকে দেবেই।

কেরামত এসে সংবাদ দিল যে বিরূদার সাথে এক লোক দেখা করতে এসেছে। শুনে বিরূদা বিরক্ত হলেন। বললেন, “গিয়ে বল আজ আমি অসুস্থ।” আমরা বারান্দায় ব’সে কথা বলছিলাম। কেরামত খানিক পর ফিরে এসে বিরূদাকে একটি চিঠি দিল। লোকটা চিঠিটা দিয়ে চ’লে গেছে। চিঠিটা খোলা হলো। ফরিদা আপা পাঠিয়েছেন।

প্রফেসর সাহেব

আমি এখন বিধবা। দুই বার বিয়ে হয়েছিল। একটা ডিভোর্স সার্টিফিকেট আছে। দ্বিতীয় ঘরে সতীন ছিল। এখন নেই।

প্রথম স্বামীর সাথে আমার সম্পর্ক প্রথম দিকে বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত খারাপ যাচ্ছিল। পরে যখন সম্পর্ক ভালো হলো এবং আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করলাম, তখন কৌশলে তার কাছ থেকে তালাক আদায় ক’রে নিয়েছিলাম। তাঁকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে এবং তাঁর মানবতাবোধকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম ব’লেই তার কাছ থেকে ডিভোর্স নেয়ার দরকার ছিল।

দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলাম সতীন দেখেই। আমি না এলে সতীনের বিয়েটা টিকে থাকত না। শুধু তাই নয়, আমার নিজস্ব পরিপূর্ণতার জন্যই আমার সতীনের ঘর দরকার ছিল।

আমার সম্বন্দে এসব জেনেও কি আপনি মনে করছেন যে আমার অভিজ্ঞতা আপনার কোনো কাজে লাগবে? এর পরও যদি আমার সাথে আলাপ করার আগ্রহ

আপনার থেকে থাকে, তাহলে তার আগে নিচের প্রশ্নগুলোকে বিবেচনা করুন। এই প্রশ্নগুলোই আপনাকে ব'লে দেবে আমার চিন্তার ধরনটা কেমন। এই প্রশ্নগুলোকে নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করার অভিজ্ঞতা থাকলে আমার কথাগুলোর মর্ম বুঝতে আপনার সুবিধা হবে।

১. মেয়েরা মাংসের চেয়ে হাড্ডি বেশি পছন্দ করে কেন?
২. কিছু কিছু মা তাদের ছেলেদের বেপরোয়া এবং অবৈধ যৌনাচারে মৌন সম্মতি দেয় কেন, এবং কেউ কেউ সে ব্যাপারে পরোক্ষভাবে ইন্ধন যোগায় কেন? কেউ কেউ আবার কাজের মেয়ে সহ অন্যান্যদের ওপর পুত্র সন্তানকে লেলিয়ে দেয় কেন?
৩. মায়েরা সুপুরষের মা হতো চায় কেন?
৪. অত্যন্ত সুশ্রী মেয়েদেরও সাজ-গোজ পোষায় না কেন?
৫. অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুৎসিত স্বামীর সুন্দরী স্ত্রী এবং সুন্দর সুঠাম স্বামীর কুৎসিত স্ত্রী দেখা যায় কেন?
৬. পথে-ঘাটে গাদা গাদা লোক সুন্দরী মেয়ে এবং মহিলাদের দিকে তাকিয়ে কাতর হলেও ঐ মেয়েরা বা মহিলারা এক নজর তাকাবার পর তাদের দিকে আর তাকায় না কেন?
৭. একটা ছেলে অদূরের একটা মেয়ের দিকে তাকালে পার্শ্ববর্তী আরেকটা মেয়েও সেই মেয়েটার দিকে তাকায় কেন?
৮. শয্যালগ্ন নারী আনন্দঘন মুহূর্তে স্বামীর সাথে বেশি আলাপ করতে চায় অথচ স্বামী তা এড়িয়ে যেতে চায় কেন?
৯. একই প্রেমিককে নারী 'তুমি কি আমাকে ভালোবাস?' প্রশ্নটা অসংখ্য বার করে কেন? সে আসলে কেমন জবাব আশা করে?
১০. মেয়েরা যত চিঠি ডাকে পাঠায়, তার চেয়ে অনেক বেশি চিঠি লেখে কেন?
১১. তরুণীরা যে-চিঠি শুধু লিখে রাখে, কারো কাছে পাঠায় না, সেগুলোকে তারা আসালে কাদের উদ্দেশ্যে লেখে?
১২. নারীর আচরণ কি তার যৌনতার নিজস্ব রীতি দ্বারা নির্ধারিত?
১৩. সুন্দরী মেয়েরা বেশি চঞ্চল হয় কেন?
১৪. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ প্রায় অনিবার্য কেন? এ থেকে কি কোনো পরিত্রাণ নেই?

১৫. অনেক মহিলা আছে যারা ঘরে-বাইরে বে-আব্রু চলাফেরা করে, পেট বুক ঘাড় ইত্যাদি ব্যাপারে বে-খবর থাকে, এবং স্বেচ্ছায় স্বল্প পোশাক পরে, অথচ বাপ-ভাইদের দেখলেই বুকে মাথায় কাপড় টেনে দেয়। কেন?

১৬. মেয়েরা বিপদের আশঙ্কা আছে জেনেও দামী অলংকার প'রে বাইরে বের হতে চায় কেন?

১৭. নারী স্বামীর উপর এমন কোন উপায়ে প্রতিশোধ নেয় যে তার স্বামী বুঝতে পারে না?

১৮. নারীকে পুরুষ যতই ভালোবাসুক, মুখে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ না করলে নারী খুশি হয় না কেন? মুখে মিষ্ট কথা ব'লে ঠকালেও নারী খুশি থাকে কেন?

১৯. পুরুষ কখন এবং কেন এক নারীকে বুকের মধ্যে রেখে তার মধ্যে অন্য নারীকে খোঁজে?

২০. শিক্ষা-দীক্ষায় এবং সামাজিক সম্মানের উচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত অনেক নারীর ব্যক্তিগত জীবনে চাপা দুঃখ বেশি থাকে কেন?

২১. অনেক নারী সুযোগ পেলে ফোন সেক্সে ধরা দেয় কেন?

২২. নারীর প্রাত্যহিক চাপা অভিমানের প্রধান সূক্ষ্ম কারণগুলো কী কী?

২৩. নারীর অর্থলোলুপতা কি তার যৌনতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত?

২৪. নারীর সৌন্দর্যের সাথে সবচেয়ে বেমানান তার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটা, তা হলো তার হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা। এর সাথে কি তার সৌন্দর্যের বা যৌনতার কোনো সম্পর্ক আছে? নারী কি তার হিংসাকে অতিক্রম করতে পারে না?

২৫. নারীর দাম্ভিকতার মূল কারণ কী?

প্রশ্নের সংখ্যা একটু বেশি হয়ে গেল বটে। তবে হাতে-গোণা কয়েকটা শব্দ ব্যবহার ক'রে জবাবগুলো দিতে চেষ্টা করা উচিত। এমনকি মাত্র দুইটা বা তিনটা শব্দ ব্যবহার ক'রে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। অন্তত আমি তাই মনে করি। সময়ের অভাবে প্রশ্নগুলোকে সাজাতে পারিনি ব'লে দুঃখিত। আপনার উদ্দেশ্য সফল হোক।'

ইতি —

ফরিদা আপা

চিঠিটা প'ড়ে বিরূদা অস্থির হয়ে উঠলেন। পেটে গ্যাস বাড়লে আলসারের রোগীরা যেভাবে ভেতর থেকে অস্থির হয়ে ওঠে, কতকটা সেরকম। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, "চল এখনই যাই।"

"কিন্তু উনি তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন সন্ধ্যাবেলায়," তাঁকে স্মরণ করাতে চাইলাম আমি।

তিনি বিড় বিড় ক'রে বললেন, "ও, তাও তো ঠিক। খানিক থেমে, "তাহলে চল বাইরে কোথাও যাই। অতক্ষণ ঘরে ব'সে থাকা সম্ভব নয়।"

বুঝলাম বিরূদা উন্মাদ হয়ে গেছেন। জ্ঞানার্জনের জন্য কিছু কিছু মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। অথচ কেউ কেউ আবার জ্ঞানী হয়ে উঠলে অন্ধ হয়ে যায়। আগামী ঘন্টা তিনেক সময়ে বিরূদাকে কী কাজে ব্যস্ত রাখা যেতে পারে? একটা বিকল্প প্রস্তাব রাখলাম, "বিরূদা, আমার মনে হয় আমরা এতক্ষণ প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি।" কিন্তু আমার কথা শুনেই তাঁর অস্থিরতা বেড়ে গেল। সুতরাং ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। "চল রাজন, অন্তত রাস্তায় নামা যাক।"

কিন্তু গেটে আমাদের পথ রোধ করলেন এক মহিলা। বোরখা পরিহিত। বিরূদা বললেন, "দুঃখিত, দাওয়াতে যাচ্ছি। দয়া ক'রে আগামীকাল আসুন।" ভদ্রমহিলা নাছোড় হয়ে বললেন, "বেশি সময় নষ্ট করব না।" সুতরাং আবারও উপরে উঠে আসতে হলো।

ঘরে ব'সে ভদ্রমহিলা আমাদেরকে চমকে দিয়ে মুখদর্শন দিলেন। ফরিদা আপা!

কিন্তু, বিরূদার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। তাঁকে কোনো কথা বলার অবকাশ না দিয়েই তিনি ব'লে উঠলেন, "তাহলে আজ দাওয়াত পাচ্ছি না?"

সহাস্য জবাব পাওয়া গেল, "আমিই এলাম স্বেচ্ছায় দাওয়াত নিতে।"

বিরূদা চিৎকার ক'রে উঠলেন, "ওয়েলকাম! ওয়েলকাম!"

শুরু হলো চা-নাস্তা এবং গল্প।

ফরিদা আপা তার গল্প শুরু করলেন, "আমার প্রথম বিয়ে যখন হয় তখন আমার বয়স আঠার বছর। ঐ সময়ে সচরাচর অধিকাংশ মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত বার-তের বছর বয়সেই। কিন্তু আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম ব'লে এবং আমার বাবা এক জন উচ্চপদস্থ শিক্ষিত সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন ব'লে গতানুগতিক প্রথার হাত থেকে আমি রেহাই পেয়েছিলাম। আজ আমি আমার কৈশোর নিয়ে বা অবিবাহিত জীবনের জীবনবোধ নিয়ে কোনো কথা বলব না। আমি সরাসরি আমার প্রথম বাসর থেকে কাহিনী শুরু করব।

আমার যখন বিয়ে হয়, তখন আমি সবেমাত্র বি.এ. পাশ কোর্সে ভর্তি হয়েছি। স্বামী ছিলেন শিক্ষিত এবং অবস্থাসম্পন্ন ব্যবসায়ী। তার বয়স ছিল ঊনত্রিশ।

বাসর রাতটা কেটেছিল পুরোপুরি সুস্থভাবে। কোনো এক্সিডেন্ট ঘটেনি। কিন্তু রাতেই আমার স্বামী আমাকে তার মায়ের সম্বন্ধে একটা তথ্য দিলেন, 'তোমাকে একটা কথা বলব, পরী।' তিনি আমার 'ফরিদা' নামের মৌখিক রূপ দিয়েছিলেন 'পরী'। তাঁকে অভয় দিয়ে বললাম, 'অবশ্যই।'

'এ ঘরে আমার সাথে যখন ব্যক্তিগত হাসি-আহ্লাদ বা আলাপ করবে, তখন একটু নিরবে তা করবে। আমাদের শব্দ যেন মায়ের কানে না যায়।'

তাঁর প্রস্তাব শুনে আমি অবাক হলাম। সে যুগের মেয়েদের জন্য গোপনীয়তা শুধু আবশ্যিকই ছিল না, তা ছিল রীতিমতো তাদের স্বভাবগ্রস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই গোপনীয়তার কৃত্রিম আবশ্যিকতা কেন? সুতরাং তাঁকে প্রশ্ন না ক'রে পারলাম না, 'আমি তো ঘুটঘুটে অন্ধকারের মতো নিস্তব্ধ থাকতে চাই। কিন্তু কারণটা কি জানতে পারি? তা জানতে পারলে সাবধান থাকতে সুবিধা হবে।'

'তুমি কিছু মনে কর না, পরী। আসলে...কিভাবে যে বলি...'

'আমার সাথে ইতস্তত করার কিছু নেই। তুমি স্বাভাবিকভাবেই বলতে পার।'

'ব্যাপারটা হলো....আমার মায়ের খুব কষ্ট।'

'তার কষ্টের বোঝা আমিও ভাগ ক'রে নেব।'

‘কিন্তু সে কষ্টের বোঝা ভাগ ক’রে নেয়া যায় না।’

‘কী সে কষ্ট?’

‘আসলে....বহুকাল ধ’রে দেখে–শুনে মনে হয় মা তার ব্যক্তিগত জীবনে অসুখী।’

আমার স্বামীর কথা শুনে আমার বুকের মধ্যে ধুক্ ক’রে উঠল। মেয়েরা চায় না যে তাদের স্বামীরা তাদের মায়েদেরকে বেশি ভালোবাসুক। তার পেছনে মেয়েদের এক জাতীয় হিংসা কাজ করে, যার অর্থ আমি পরে বুঝেছিলাম, এবং তা আমি পরে ব্যাখ্যা করব। কিন্তু স্বামীরা যদি তাদের মায়েদের ব্যক্তিগত জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্য তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল হয়, তাহলে মেয়েরা আরো বেশি হিংসায় জ্ব’লে মরে। আমার যতদূর মনে পড়ে, হিংসার উপাদানটা আমার মনে তেমন বেশি ছিল না। তবুও ছিল। নিষ্পাপ দেবী হবার মতো কোনো অসাধারণ মেয়ে আমি ছিলাম না। জানতে চাইলাম, ‘কেমন ধরনের সমস্যা?’

আমার স্বামী খানিক ইতস্তত ক’রে জবাব দিলেন, ‘আসলে আমার বাবা যৌবন বয়স থেকেই রোগা। তাছাড়া তিনি তেমন সুপুরুষও নন। ভীরু। ব্যবসার ভাগ্য ভালো ব’লে সহজে টাকা রোজগার করতে পারেন। কিন্তু সংসার চালাতে হয় মাকে। অবশ্য এখন আমিও তাকে সাহায্য করি। সংসারে এখন বাবার কোনো ভূমিকা নেই। তার ওপর উঠতে বসতে খিস্তি চলে। তিনি যতক্ষণ বাসায় থাকেন, ততক্ষণ তাঁকে ঘরের এক কোণায় ভিজে বিড়ালের মতো জড়োসড়ো হয়ে থাকতে হয়। প্রতিবাদ করার স্পৃহাও তার নেই।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু মায়ের তো এখন বয়স হয়েছে। উনি তো এখন যৌবন পার হয়েছেন।’

‘তা ঠিক। কিন্তু আক্ষেপ আর প্রতিহিংসা রয়ে গেছে। তোমাকে কথাটা বলতাম না। ব’লে আমারই ক্ষতি হলো। দুর্বলতা তো আমারও থাকতে পারে। তবুও বলতে হলো তোমার ভালোর জন্য। আমি চাই না তুমি শুরু থেকেই তার কুনজরে পড়।’

‘কিন্তু তোমার কেন মনে হচ্ছে যে আমার সুখ দেখলে তিনি ঈর্ষান্বিত হবেন?’

‘কেন মনে হচ্ছে তা বলতে পারব না। তবে মনে হলো এই সমস্যাটা হতে পারে, তাই বললাম।’

আমার একটু খারাপ লাগল। মেয়েদের সন্দেহ এত বেশি যে কখনো কখনো তারা তাদের স্বামীদের সাথে তাদের মায়েদের সম্পর্ককেও সন্দেহের চোখে দ্যাখে। তারা এসব ক্ষেত্রে কোনো কথা বলার আগে নিজেদের দিকে তাকায় না।

কিন্তু আমার স্বামীর কথা ফলল, তবে ঠিক বিপরীতভাবে। তাঁর মায়ের অসম্পূর্ণতার দায়িত্ব এবং কষ্টের বোঝা আমাকেও ঘাড় পেতে নিতে হলো।”

“কিভাবে?” বিরূদা এবং আমি এক সাতে প্রশ্ন ক’রে উঠলাম।

“বলছি শুনুন। প্রথম তিন দিন স্বামীর কথামতো ঘরের মধ্যে অত্যন্ত চুপিসারে হানিমুন চলত। কাক-পক্ষীও টের পেত না। ব্যাপারটাকে আমি এমনভাবে নিয়েছিলাম যে, আমার শাশুড়ি যতক্ষণ জেগে থাকতেন কিংবা যতক্ষণ রান্নাঘরে থাকতেন (আমাদের নবদম্পত্তির রুমটা ছিল রান্নাঘরের পাশে), ততক্ষণ আমি স্বামীর কাছে যেতাম না। আমার স্বামী হয় ঘুমিয়ে না হয় পড়াশুনা ক’রে না হয় ব্যবসায়ের কাগজ-পত্র ঘাটাঘাটি ক’রে সময় কাটাত। কিন্তু আমার শাশুড়ি ঘুরে ফিরে আমাকে বলতেন ঘরে যেতে। হাসি-মুখে তাকে বলতাম যে আমি তাঁর কাজে একটু সাহায্য করতে চাই। কিন্তু তিনিও যতদূর সম্ভব হাসিমুখে আমাকে ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। অনন্যোপায় হয়ে আমি ঘরে ঢুকতাম, তবে দরোজাটা খোলাই রাখতাম, যেন সবাই জানতে পারে যে দরোজাটা সবার জন্য খোলা। কিন্তু আমার শাশুড়ি রান্নাঘরে দরোজার কাছেই সময় কাটাতেন বেশি। আমি দরোজা বন্ধ করছি না দেখে তিনি আমাকে তৃতীয় দিন ডেকে নিয়ে ধমক দিলেন, ‘তুমি দরোজাটা হা ক’রে রাখ কেন, বউ মা? নোতুন স্বামী-স্ত্রীর ঘর। দরোজা বন্ধ রাখতে পার না?’

আমার কাছে সবকিছু ধাঁধাঁর মতো লাগত। তিনি আমাকে দরোজা বন্ধ করতে বলছেন, অথচ তিনি নিজেই দরোজার সামনে ব’সে আছেন। বললাম, ‘সব সময়ে কি আর দরোজা বন্ধ রাখার দরকার হয় নাকি, মা? তাছাড়া বন্ধই তো রাখি। মাঝে মাঝে খোলা রাখি।’

'আমি তো দরোজাটা সব সময়ে হা করাই দেখি। ঘরে শেয়ানা মেয়ে আছে। দরোজা বন্ধ রাখতে হয়।'

শেয়ানা মেয়েটা আমার ননদ। নাম দিপা। বললাম, 'সময় হলে তো বন্ধই ক'রে রাখি, মা।'

'আমি তো কোনো সাড়া-শব্দ পাই না। ঘরের মধ্যে কি ম'রে প'ড়ে থাক নাকি? এই বয়সে ঝিমিয়ে থাকা উচিত না।'

তাঁর কথা শুনে সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। ভাবলাম তিনি আমাকে অক্ষম ঠাওরাচ্ছেন। প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হলো। বললাম, 'কিন্তু আপনার ছেলেই তো চুপচাপ থাকতে চায়। তাই তাঁকে জ্বালাতন করি না।'

আমার কথা শুনে তার চোখ-মুখ জ্ব'লে উঠল। আমাকে হাত ধ'রে নিয়ে গেলেন বারান্দায়। তারপর বুঝাতে শুরু করলেন, 'শোনো বউমা, মেয়েদেরই উচিত পুরুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা। তার মানে এই না যে তুমি একাই সব কিছু করবে আর রোকন (আমার স্বামীর নাম) চুপচাপ প'ড়ে থাকবে। তা কখ্খনোই করবে না। ওকে ক্ষেপিয়ে দেবে। পুরুষদেরকে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে দিতে হয় যেন ক্ষেপা খেয়ে তারাই বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বিছানা-পাতি লণ্ড-ভণ্ড ক'রে দেয়। আমি যেন এর পর থেকে দেখি যে তুমি ফিটফাট হয়ে ঘরে ঢুকেছ আর আলু-ছালু হয়ে বের হয়ে এসেছ। আমি চাই তোমরা সুখী হও।'

তাঁর কথা শুনে বুঝতে আর বাকি রইল না যে তিনি যে-কথা তাঁর ছেলেকে বলতে চান কিন্তু পারেন না, আমাকে তাই বলেছেন। তিনি আসলে প্রমত্ত ক'রে তুলতে চাচ্ছেন তাঁর ছেলেকে এবং নিস্তেজ, বিধ্বস্ত হিসেবে দেখতে চাচ্ছেন আমাকে।

বাপের বাড়ি গিয়ে মাকে সব ঘটনা খুলে বললাম। শুনে মা বললেন, 'ও কিছু না। মায়েরা চায় যে তাদের সন্তানদের ব্যক্তিগত জীবন সুখের হোক, তৃপ্তিময় হোক। এ ব্যাপারে তারা প্রথম নিশ্চয়তা চায় বিয়ের প্রথম কয়েক দিনের বিছানা-পত্তর থেকে।' আমি মাকে বললাম, 'কিন্তু আমার তো কোনো সমস্যা নেই।' মা বললেন, 'সমস্যা যে নেই তা প্রমাণ করবি।' কিন্তু তোমার জামাই তো চুপ থাকতে বলে।' মা বললেন, 'তাহলে তুই চুপ থাকবি। কিন্তু রোকনকে চুপ থাকতে দিবি না।'

বাপের বাড়ি থাকাকালীন আমার স্বামীর একটা বিস্ময়কর রূপ দেখলাম। ঐ কয় দিন আমাদের শয্যাযাপন ছিল সশব্দ। ঘরে আমরা কী করছি তা বাইরে ব'সে ব'লে দেয়া যেত। অথচ তখন তাঁর কোনো গোপনীয়তা বা নিরবতা পালন করার তাদিদ দেখলাম না। বরং বাবা বাসায় থাকলে সে চুপ থাকত। অথচ শোবার ঘরের আশে-পাশে কোথাও মা আছে বুঝতে পারলে সে বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠত। বিছানায় একটু ন'ড়ে শোয়ার দরকার হলেও সে তা একটু বেশি কৃত্রিমভাবেই করত, যেন খাটের নড়াচড়ার শব্দটা স্পষ্টভাবে শোনা যায়। তার গোঁফের মধ্য দিয়ে ফোস ফোস ক'রে ছেড়ে দেয়া নিঃশ্বাসও সে নিয়ন্ত্রণ করত না।

অবশ্য আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আমার কাছেও তা খারাপ লাগত না, বরং ভালোই লাগত। কেন যেন আমার মাকে আমার জানাতে ইচ্ছে করত যে আমি সুখী। সে সুখটা অকৃত্রিম, তবে জানাবার উপায়টাকে কেন যেন কৃত্রিমতা দিয়ে ফেলতাম।

শ্বশুর বাড়ি ফিরে আসার আগেই একটা চিন্তা মাথায় এল: আমার মাকে আমার স্বামী জানাতে চায় যে সে সার্থক এবং সুপুরুষ। আর আমি আমার মাকে জানাতে চাই যে আমি সুখী। এখানে আমার স্বামীর আচরণটা স্বাভাবিক এবং আমার আচরণটার ক্ষেত্রে হয়তো ফ্রয়েডের তত্ত্ব খাটে। তার অবচেতন উৎস-মূলে হয়তো কাজ করছে কোনো ঈর্ষা। ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুসারে, ছেলে তার যৌন লক্ষ্য হিসেবে মাকে এবং মেয়ে বাবাকে বেছে নেয়। ফলে ছেলে ঘৃণা করে বাবাকে এবং মেয়ে মাকে। হয়তো আমি মাকে বুঝাতে চেয়েছিলাম যে তিনি বাবাকে পেয়ে যত সুখী আমি আমার স্বামীকে পেয়ে তার চেয়ে বেশি সুখী। হয়তো বাবার বিরুদ্ধে আমার অবচেতনের মেয়েলি প্রতিশোধ কাজ করছিল—বাবা, আমার চেয়ে নিম্নমানের একটা মেয়ে নিয়ে তুমি অতটা সুখী হতে পার না যতটা সুখী হতে পারে আমার মতো একটা আদর্শ মেয়ে নিয়ে আমার স্বামী। হয়তো একই প্রক্রিয়ায় আমি আমার মাকেও দেখাতে চেয়েছিলাম আমার বিজয়—মা, তোমার মতো সাধারণ একটা মেয়ে আমার বাবার মতো অসাধারণ একটা পুরুষকে নিয়ে আর কতই বা সুখী হতে পারে? দ্যাখ না, আমি এক জন সাধারণ পুরুষ নিয়েও তোমার চেয়ে বেশি সুখী। কিন্তু আমার স্বামী তাঁর নিজের মায়ের ব্যাপারে যে-আচরণটা করছে, তাতে পক্ষপাতিত্ব আছে; বরং সেখানে *আমার* কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। তবুও হয়তো এটা এক জাতীয় ভারসাম্য।

হয়তো মা যা বলেছেন তাই ঠিক। হয়তো মনের স্বাভাবিক স্তরের ভেতরকার গড়নটা কতকটা অস্বাভাবিক।

কিন্তু শ্বশুড়বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম একটা অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করার মহড়া চলছে। কারণ আমার শ্বাশুড়ির বিগত জীবন স্বাভাবিক যায়নি। গিয়ে দেখি তিনি আমাদের শোবার ঘরের খাটটা পাল্টে সেখানে একটা পুরনো নড়বড়ে খাট পাতিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, কিছুদিন পর আমাদের জন্য আলাদা ঘর দেয়া হবে। সেখানে সবকিছু থাকবে নোতুন, চকচকে। খাটটাকে নোতুন ক'রে রং-পালিশ করা দরকার। বুঝলাম আমার শ্বাশুড়ি চান শব্দ। তিনি চান ঘরের মধ্যে প্রলয় হয়ে যাক। আমি বিধ্বস্ত হই। খাট জব্দ হোক। তার পুত্রসন্তান সুপুরুষের মতো নৈশবিজয়ের পর পাহাড়ের মতো মাথা উঁচু ক'রে মায়ের সামনে গিয়ে ভোরবেলায় দাঁড়িয়ে বলুক 'মা, ভাত দাও', এবং আমি তখনও নৈশক্লান্তি মোচন করার জন্য বিছানায় নেতিয়ে তাকি, যেখান থেকে আমার ননদ আমাকে ডেকে তুলে রোগী-হাঁটা ক'রে নিয়ে যাবে বাথরুমের দিকে, এবং আমি ঈষদুষ্ণ পানির কলকল কোলাহল দিয়ে বিগত রাতের বাসি ইতিহাসকে ধুয়ে-মুছে পাক-সাফ হয়ে আবার ডায়নিং টেবিলে ফিরে যাব, যখন আমার আধো-নত চোখের পাতা এবং ঘাড়ের কোমল মাংসের ক্লান্তি দেখে বুঝতে পারা যাবে গত রাতের ঝড়টা ছিল কত বড়। এরূপ দৃশ্য সৃষ্টি করতে আমারও কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়, যেহেতু তার মাধ্যমে আমি আরেকটা মেয়ের পরাজয়ের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি। মেয়েরা চায় স্বামীদেরকে তাদের মায়েদের ওপর বিতৃষ্ণ ক'রে তুলতে। কিন্তু আমার শাশুড়ি আসলে তার ছেলের সুখী দাম্পত্য জীবন চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এক জন দুর্ধর্ষ পুরুষের মা হতে, যে এক রাতে একটা নারীকে আস্ত গিলে খেতে পারে, লণ্ড-ভণ্ড ক'রে দিতে পারে। *যারা সুপুরষের স্ত্রী হতে ব্যর্থ হয়, তারা সুপুরুষের মা হতে চায়। স্বামী হোক আর ছেলে হোক, পুরুষ ছাড়া নারীর চলে না।* একটা স্বেচ্ছাকৃত দৃশ্যমান পরাজয় মঞ্চায়িত করার মাধ্যমে আমাকে এখন এক জন পুরুষকে সুপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হবার সুযোগ ক'রে দিতে হবে। কিন্তু আমার স্বামীকে কি বলব তাঁর মা আসলে কী চান? তা কি তিনি বিশ্বাস করবেন? তাতে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হবে না তো?

চিন্তা ক'রে কোনো কূল-কিনারা পেলাম না। ফলে কোলাহলপূর্ণ শয্যাযাপন বেছে নিলাম। নর-নারীর যে-সব ব্যক্তিগত কানাকানি, হাতাহাতি, ওষ্ঠপীড়ন, এবং শরীরচর্চা থাকে, সেগুলো ওপেন সিক্রেট, কিন্তু তাই ব'লে তা নিয়ে হাঁটে হাড়ি ভাঙার

কিছু নেই। তবুও আমাকে ঘরের মধ্যে হাড়ি ভাঙতে হলো, অন্তত রান্নাঘর পর্যন্ত সে শব্দ যেন পৌঁছানো যায় সে চেষ্টা করতাম। কিন্তু বিধি আমার বাম। বিছানায় আমি যত সক্রিয় হয়ে উঠি, তত আমার স্বামী সরব হয়ে ওঠেন—ঠিক উৎফুল্লতায় নয়, কতকটা ব্যথায় ককিয়ে ওঠার মতো। পুরুষ যখন নারীকে ব্যক্তিগত মুহূর্তে ওষ্ঠলগ্ন আদর দিতে গিয়ে মাঝে-মধ্যে সদন্ত সোহাগ দিয়ে ফ্যালে, কিংবা আকস্মিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তেজনার কারণ ঘটায়, তখন নারী তার কৃতজ্ঞতা জানায় কোকিলের মতো কিচির মিচির শব্দ বা ছেড়া-ভাঙা কলবর দিয়ে। এরকম আচরণ পুরোপুরি মেয়েলি, এবং একমাত্র মেয়েদেরকেই তা মানায়। কিন্তু *পুরুষ যখন নিজের ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়, তখন নারীই পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং পুরুষ নারী হতে না পেরে কাপুরুষের ভূমিকা বেছে নেয়।* আমাদের ক্ষেত্রেও হয়েছিল তাই। আমার স্বামী তাঁর মাকে বুঝতে দিতে চান না যে তিনি সুখী, অথচ আমাকে আমার শাশুড়ির মন রক্ষা করতে হবে। ফলে আমি পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম। কিন্তু আমার স্বামীর 'ওহ ব্যথা পাচ্ছি,' ইস লাগছে তো' ইত্যাদি গোছের সরব প্রতিক্রিয়া শুনে আমার শাশুড়ি আরো ক্ষেপে গেলেন। দু'দিন না যেতেই তিনি আমাকে ধরে বললেন, 'বউমা, আমি ভেবেছিলাম তুমি দাজ্জাল মেয়ে নও। কিন্তু এখন দেখছি তুমি তাই।'

'কিন্তু মা, আমি কী দোষ করলাম যে....'

'কী করলে মানে? রোকনকে একটু নিশ্চিন্তে থাকতেও দাও না, যখন তখন জ্বালাতন কর। যৌথ পরিবারের সংসার। তার মধ্যে মেয়েদের অত নির্লজ্জতা ভালো দেখায় না।'

আমি আমার শাশুড়ির সমস্যাটা বুঝে ফেলেছিলাম। ফলে আর কথা বাড়াইনি। এদিকে দিন দিন আমার শাশুড়ির চোখের কাঁটাতে পরিণত হতে লাগলাম। বছর খানেকের মধ্যে আমার স্বামীয় আমাকে রীতিমতো ভুল বুঝতে শিখে ফেলল। তাছাড়া দোষী সাব্যস্ত হবার মতো যথেষ্ট বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া আমি ততোদিনে আমার আচরণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ক'রে ফেলেছি। এখন আমি আমার প্রতি শাশুড়ি-ননদের রূঢ় আচরণের প্রতিবাদ করি, তারা দশটা কটূবাক্য বললে আমি পাঁচটা বলি। সুতরাং আমি আর লক্ষ্মী বউমাটি নেই। প্রবাদে আছে 'নারীর খাদ্য নারী। নারী নির্যাতনের প্রথম এবং মৌলিক কারণ নারীই। নারী নির্যাতন আর যৌন নির্যাতন অবশ্যই এক কথা নয়।

যৌন নির্যাতন একটা আইনী ব্যাপার—তা যারা করে তারা সমাজের দাগী অপরাধী। তারা তা করে গায়ের জোরে। তা সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে প্রথার দ্বারা লালিত হয় না, প্রথার বা কাঠামোর সামান্য দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তা হয়তো কখনো কখানো বেড়ে ওঠে। *তা যারা করে, তারা নিজেরাও জানে যে তারা অপরাধী।* ফলে সমাজ থেকে তা বিলুপ্ত করা কঠিন কোনো কাজ নয়। কিন্তু নারী নির্যাতন সমাজের তথা পরিবার-সম্পর্কিত মানবীয় চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে বেঁচে থাকে এবং বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক মাত্রার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃত নারী-নির্যাতন হলো নারীর মনস্তত্ত্বের এবং ব্যক্তিত্বের ওপর হস্তক্ষেপ। এই হস্তক্ষেপ প্রথম আসে নারীর কাছ থেকেই। আমাদের সমাজে নারী তার অসম্পূর্ণতা এবং অক্ষমতার যাবতীয় দোষ চাপায় পুরুষের ঘাড়ে এবং প্রতিশোধ নেয় আরেকটা নারীর ওপর। যে মহিলা নিজে সুখ বা স্বাধীনতা পায়নি, সে চায় না তার সংসারে এসে তার ছেলের বউ তা পাক। যে আজীবন সাধনা ক'রে যা পায়নি বা পেয়েছে, সে চায় না যে তার ছেলের বউ বিনা শ্রমে সহজে তা পেয়ে যাক। ফলে ছেলের বউ হওয়া বড় দুর্ভাগ্যের। অথচ সেই ছেলের বউ আবার যখন শাশুড়ি হয়, তখন সেও বেমালুম ভুলে যায় সেও ছিল এক কালের মজলুম কোমল ললনা। এই ধারা বউ-মা পরম্পরায় যুগ যুগ ধ'রে চ'লে আসছে। এবং *চরমে গিয়ে সব বউমা-ই শাশুড়ি হয়ে উঠছে।* বংশ-পরম্পরায় কয়েক ডজন খাঁটি উদার এবং একই সাথে কঠোর পুরুষের আবির্ভাব ঘটলে এই প্রথার পতন ঘটবে। কিন্তু *পুরুষ বড় অসহায়। তার পক্ষে জগৎ জয় করাও সহজ, অথচ সংসার জয় করা অত্যন্ত দুরূহ। কারণ, যার বুকের মধ্যে সে স্বর্গসুখ পায় তার পায়ের নিচে তার জন্য স্বর্গ নেই। আবার যার পায়ের নিচে তার স্বর্গ, সে-ই সংসারে নরকের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। পরকাল রক্ষার জন্য তাকে মায়ের মন যোগাতে হয়, এবং স্ত্রীকে অবহেলা করতে হয়, ঘৃণা করতে হয়। ইহকাল নষ্ট হয়। কেউ কেউ আবার ইহকালকে রক্ষা করতে গিয়ে স্ত্রীর পূজা করে, মাকে ত্যাগ করে।* উভয় ক্ষেত্রেই ফল হয় একই—সব নারী নারী-বিদ্বেষ রয়ে যায়। নারী নির্যাতন টিকে থাকে। পুরুষ অত্যন্ত কোমল। নারীর সান্নিধ্যে পুরুষের কোমলতা এবং নমনীয়তা নারীর কোমলতাকে হার মানায়। তাই পুরুষের দ্বারা নারী নির্যাতনের মতো কঠোর রীতি সমাজে বহাল রাখা সম্ভব নয়, যদি না তার পেছনে নারীর ইন্ধন থাকে।

আমার অবস্থা আরো খারাপ হলো যখন আমার শ্বশুড় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর সেবা-যত্ন আমি করতাম। তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। তাঁকে একটু সঙ্গ দেবার মতো

আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমাকে তিনি এমনিতেই খুব ভালোবাসতেন। তার সাথে যুক্ত হলো আমার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ। আমার প্রতি তার সহানুভূতি যত বাড়তে লাগল, তত শাশুড়ি-ননদ-স্বামীর পক্ষ থেকে আমার ওপর অত্যাচার প্রবলতর হতে লাগল। এবং আমার শ্বশুরের প্রতি আমার মমত্ববোধ তত আরো বাড়তে লাগল। সেই কাপুরুষটাকে আমি সন্তানের মতো ভালোবাসতে শিখলাম। লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য এবং তাঁকে সেবা করার সুবিধার জন্য আমি তখনও পর্যন্ত কোনো সন্তান নেইনি।

কিন্তু আমার কোল খালি ক'রে দিয়ে আমার সেই শিশুটা পরবর্তী বছর খানেকের মধ্যে পৃথিবীর মায়া আর স্ত্রী দুঃশাসনের কারাগার থেকে মুক্তি নিয়ে চিরতরে চ'লে গেল। বড় একা হয়ে গেলাম আমি।

মৃত্যুর বেশ কিছুকাল আগে থেকেই আমার শ্বশুর বুঝতে পেরেছিল যে এ যাত্রায় তিনি আর রক্ষা পাবেন না। তিনি তাই লুকিয়ে লুকিয়ে বিছানায় শুয়ে আমার জন্য একটা লম্বা চিঠি লিখে রেখেছিলেন। মৃত্যুর প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তিনি ওটা আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুযোগের অভাবে পড়া হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর কিছুকালের জন্য শ্বশুরবাড়ি থেকে ছুটি নিয়ে বাপের বাড়ি চ'লে গেলাম। সেখানে গিয়েই চিঠিটা খুললাম।

বউমা

আমার আজীবনের স্নেহ এবং কৃতজ্ঞতা তোমার জন্য। তুমি সত্যিকার অর্থে একজন ভালো মানুষ। আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি, আমি যদি জীবনে সামান্য পুণ্যও ক'রে থাকি, তাহলে তার ভাগ যেন তুমি পাও।

বউমা, সম্ভবত আমার যাবার সময় হয়েছে । তাই ভাবলাম আমার জীবনের কিছু মূল কথা তোমাকে ব'লে যাই। মানুষ যখন জীবনে কিছুই পায় না, শুধু দুঃখ পায়, তখন শেষ পর্যায়ে সে চায় যে অন্তত কেউ তার দুঃখের কথাগুলো শুনুক। অবশ্য তোমাকে আমার কিছু কথা শুনাব শুধু আমার বুকটা খালি করার জন্য নয়, তোমারও মঙ্গলের জন্য। আমার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের কাজে লাগেনি, তবে তা তোমার জীবনের কাজে লাগতে পারে।

আমাকে কাপুরুষ বলা হয়। আসলে আমি তাই। তবে পৌরুষের দোষেনয়, হার্টের এবং রক্তের দোষে। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে তোমার শাশুড়ির কাছে আমি ছিলাম একজন আদর্শ পুরুষ। আমি হালকা-পাতলা এবং রোগাটে ছিলাম বটে, তবে তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের সুস্থতার বা অসুস্থতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তোমার শাশুড়ির ভাষায়, 'তোমার মতো স্বামী আমার মতো একটা মেয়ের জীবনে বড় পাওয়া' আমিও তাঁকে খুব ভালোবাসতাম।

কিন্তু আমার কিছু দুর্বরতা ছিল, যার ফলশ্রুতি হলো আমার এই জীবন এবং সংসারের এই হাল। প্রথম দুর্বলতা হলো, আমি ফজিলাকে—অর্থাৎ তোমার শাশুড়িকে—এত ভালোবাসতাম এবং এক স্ত্রীর সাজানো সংসার নিয়ে আমি এতই তৃপ্ত ছিলাম যে, তাঁকে সর্বদা বুকের মধ্যে রাখতে চাইতাম। মানুষ যেভাবে সন্তানকে আগলে রাখে, কতকটা সেরকম। আমার ধারণা ছিল নারী আশ্রয় চায়। কিন্তু পরে ভুলটা ভেঙেছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, নারী আশ্রয় চায়, অথচ সে অপরকে বুঝাতে চায় যে সেই আশ্রয় দিচ্ছে। তাই সার্বক্ষনিক আশ্রয় সে পছন্দ করে না। তাছাড়া সে নিজের থেকে কিছু করতে চায়। তাকে তার সাধ্য অনুযায়ী বিভিন্ন সামাজিক কাজের দায়িত্ব এবং অধিকার দিতে হয়। তাকে বুকে আগলে রেখে সব কাজ নিয়ে ক'রে দেয়া ঠিক নয়। আসলে, প্রতিবেশির সাথে কোনো সমস্যা হলে, কিংবা মুদি দোকানের হিসাবে অমিল হলে, কিংবা ফার্নিচারের দোকান থেকে খারাপ মাল এলে, বা এরূপ অন্য কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটলে সে আগবাড়া হয়ে তাতে নাক গলাতে যেত। তার মুখের ভাষাও ছিল বড্ড খরকরে, তাতে সামাজিক মসৃণতা ছিল না। এ কারণে আমি তাকে বলতাম, 'তুমি নিশ্চিন্তে থাক, আমি দেখছি।' কিন্তু তাকে থামালে সে আমার ওপর ক্ষেপে যেত। আমার ছিল এক জাতের মেকি আত্মসম্মানবোধ। আমার বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই ছিলেন সমাজের গণ্য-মান্য এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। আমি ভাবতাম, আমার স্ত্রীকে দিয়ে আমি সমস্যা-সমাধানের মতো নিচু কাজ করাব? তা কেন? সমস্যা থাক আমার। সে সুখে থাক। তাকেও যদি সমস্যার মধ্যে টেনে আনতে হলো তাহলে আর আমি এত পরিশ্রম সাধনা ক'রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি কেন? আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই সম্মান করি—কেননা আমি নিজেকে সম্মান করি। আমার মতো ব্যক্তির সম্মান পাবার উপযুক্ত যে, সে কেন তর্কাতর্কি করতে যাবে একজন সামান্য মুদি দোকানের বিক্রেতার সাথে? কিন্তু সে ওটাই করতে চাইত। সেসব না করতে দিলে সে মনে করত যে আমি তাকে কোনো গুরুত্বই দিচ্ছি না। তিলে তিলে আমি বুঝে

ফেললাম যে ওটা ছিল তার স্বভাব, রক্তের দোষ—কোনোভাবে বংশ-পরম্পরায় কোনো পূর্ব পুরুসের কাছ থেকে সে স্বভাবটা পেয়েছে। কারণ আমি তাকে সব কিছু বিশ্লেষণ ক'রেও আমার মনের অবস্থাটা বুঝাতে পারিনি। এবং তাঁকে তাঁর মতো আচরণ করতে দিয়েও দেখেছি যে সে ভুল করে। নিজেকে শোধরাতে চায় না। ভুলের পথ ধ'রেই সে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অবশেসে, বিয়ের মাত্র তিন চার বছরের মধ্যে, আমি তাঁকে কর্তৃত্ব করার সুযোগ দিলাম। তা না দিলে ঘরের মধ্যে শান্তি বজায় থাকত না ব'লে আমি মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝি যে আমার সংসারের অশান্তির প্রথম কারণ ছিল আমার সেই দুর্বলতা।

তার ফলে আমার ওপর বিভিন্ন লোকের অসন্তোস বাড়তে লাগল। মানুষের মনে কষ্ট দিতে হচ্ছে দেখে আমি ভেতরে ভেতরে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু তার কারণে অন্য কোনো ঝামেলার সৃষ্টি হতো না। আমার সমাজে আমি বেশ কিছুটা প্রভাবশালী ছিলাম ব'লে আমাকে সরাসরি কারো কাছে অপমানিত হতে হয়নি। কিন্তু তার পরও আমি তাঁকে মাঝে মধ্যে বুঝাতাম। বুঝাতে গেলেই হতো যত ঝামেলা। সে মনে করত যে আমি তাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিচ্ছি না, ছোট ভাবছি, এবং সে ছোট ব'লেই আমি তাকে বড় ক'রে তুলতে চাচ্ছি। সে হীনমন্যতায় বা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভুগত। বউমা, বলা হয়ে থাকে যে, 'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।' কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে এই কথাটার কোনো মানে নেই। *যে বড় নয়, সে কোনোদিন ছোট হতে পারে না।* আমি তাকে আসলে বড় হতে বলিনি, বলেছিলাম ছোট হতে, কোমল হতে, বন্ধুভাবাপন্ন হতে।

আমার দ্বিতীয় যে দুর্বলতাটা ছিল তাই আমার ধ্বংস ডেকে এনেছিল। তা হলো এই যে, তাকে বুদ্ধিমতি এবং বিশাল-হৃদয় ক'রে তোলার জন্য আমি সম্ভাব্য সব উপায় অবলম্বন করেছিলাম, শুধু একটা উপায় বাদে—*আমি তাকে ভুল করার সুযোগ দেইনি।* এবং নিঃসন্দেহে এটাই ছিল আমার আজকের নিয়তির মূল কারণ। আমি ভেবেছিলাম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির মূল কাঠামো হলো তত্ত্ব। ফলে তাকে শুধু তত্ত্বকথা শুনিয়েছি এবং নিজের আচরণ দিয়ে শেখাবার চেষ্টা করেছি। আমি অভিজ্ঞতার মাত্রাটকে একেবারে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিছু কিছু জিনিস শিখতে হলে যে সেসব ক্ষেত্রে ভুল করতে হয়, তা আমি তখন বুঝতাম না। তাছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে ভুল ক'রে কিংবা অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখতে হলে সে জ্ঞান আর জীবনের কাজে

লাগে না। কারণ সেই জ্ঞান দিয়ে যাকে লালন করা হবে, সেই অভিজ্ঞতা বা ভুলই তাকে ধ্বংস ক'রে দেয়। সম্ভবত বুঝতে পারছ যে আমি নারীর চরিত্র-সংরক্ষণের কথা বলছি। তাহলে একটু খুলে বলি।

বিয়ের কয়েক মাস পর থেকে ফজিলাকে নিয়ে আমি বিভিন্ন বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যেতাম, পার্টিতে যোগ দিতাম, শপিং করতাম। কিন্তু কিছু কিছু পার্টিতে সমস্যা হতো। সেখানকার বাঁধন-ছাড়া সামাজিকতা আমার কোনোদিন পছন্দ হতো না। তবুও ব্যবসায়ের এবং বন্ধুত্বরক্ষার খাতিরে আমাকে তাতে যোগ দিতে হলো। আমি জানতাম ফজিলা এরূপ সামাজিকতায় অভ্যস্ত নয়। ফলে সে হয়তো তা থেকে দূরে থাকবে নয়তো সে তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং নিজের নিজস্বতা হারাবে। কিন্তু প্রথম প্রথম সে একটু বিব্রত হলেও পরিণামে সে তার তাৎক্ষণিক আবেগ এবং বোকামির কাছে হার মেনেছিল। আমি চাইতাম সে মার্জিত পোশাকে ওসব জায়গায় যাক। কিন্তু তাতে তার মান যেত। আমাকে কাপুরুষ এবং মৌলবাদী বলত। এদিকে সেসব পার্টিতে যারা যোগ দেয়, তাদের অনেকেই আসলে লোচ্চা, এবং তাদের মনে সর্বদা কোনো-না-কোনো কু-অভিসন্ধি থাকে। তারা নির্লজ্জের মতো ফজিলার রূপের এবং পোশাকের প্রশংসা করত। ছোট-খাট উপহার দিত। ফজিলার পা আর মাটিতে পড়ত না। সে ভাবত, সংসারে তার কোনো কদর নেই, অথচ এই লোকগুলো তার প্রকৃত রূপটাকে দেখতে পেরেছে। সে আসলে কত সুন্দরী এবং উপযুক্ত তা সে বুঝতে শিখিয়েছিল সুবিধাবাদী কিছু লম্পট লোকের উচ্চ প্রশংসা এবং তৈলাক্ত আলাপ থেকে। *হায় নারী! সে পথে-ঘাটে-বাজারে পার্টিতেই বেশি সুন্দর হয়ে উঠতে চায়। এক দল যুবক তার দিক তাকিয়ে চৈত্রের কুকুরের মতো কাতর হলে সে ভাবে যে তার মূল্য অসীম এবং তারা সবাই তাকে বেসামাল ভালোবাসে। একটুও ভেবে দ্যাখে না যে ওটা পুরুষের স্বভাব। ঐ পুরুষেরাই আবার যখন বিয়ে করার উদ্দেশ্যে মেয়ে দেখতে থাকে, তখন তার মতো হাজার মেয়েকেও তাদের পছন্দ হয় না।* তাদের কাছে পথে-ঘাটের সব নারীকেই অপূর্ব সুন্দর ব'লে মনে হয়—অন্তত তারা নারীকে তাই জানাতে চায়; অথচ নারীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থত্যাগ করতে হলে বা তাকে ঘরে তুলে নেয়ার প্রশ্ন উঠলে তাদের সৌন্দর্য-চেতনা বিস্ময়করভাবে পাল্টে যায়। পথে-ঘাটে শত শত পুরুসের প্রশংসা এবং আড়-নজর বয়ে নিয়ে বেড়ানো অনেক, অনেক মেয়ের বাবারা যে হতাশ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, তা কি তারা একবারও ভেবে দ্যাখে না? ফজিলা পড়েছিল প্রশংসার ফাঁদে।

সে কোন পরিণতির দিকে যাচ্ছে তা ভেবে আমি শংকিত হতাম। পুরুষ আত্মমগ্ন, কারণ সে আত্মবিশ্বাসী। নারী গতিশীলভাবে সামাজিক, কারণ সে স্বভাববশত সেরকম এবং সে সামাজিকতার বিস্তৃতি দ্বারা জানতে চায় সে পরাধীন কি না কিংবা তার স্বাধীনতার পরিধিটা কত বড়। আমি চাইনি ফজিলা নিজেকে পরাধীন ভাবুক। আমি শুধু তাকে আত্মসচেতন হবার জন্য অনুরোধ করতাম। কিন্তু আমার নিষেধ যত প্রবল হতো, তত তার স্বাধীনতার স্বাদ বেড়ে যেত। আমার নিষেদের মধ্যে সে রহস্য খুঁজে পেত এবং সে আমাকে ঈর্ষান্বিত কাপুরুষ ঠাওরাত। সে মুখ ফুটে তা বলতও। তবুও আমি তার অনেক কথাতে কান দিতাম না। সেখানে হতো আরেক ঝামেলা। নারীর কথায় কান দিলেও দোষ, না দিলেও দোষ। কান না দিলে তার হীনমন্যতা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। তখন সে ভাবে যে তার কথাগুলোকে হয়তো ঠিকমতো গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এ এক রহস্যজনক বৈশিষ্ট্য। আমাকে সে গালাগালি ক'রে ধুয়ে দিলেও চুপ ক'রে থাকা যাবে না, আবার পাল্টা আক্রমণও করা যাবে না: চুপ ক'রে থাকলে কিংবা হেসে উড়িয়ে দিলে সে ভাববে তার টার্গেট মিস হয়ে গেছে, আরো কটূবাক্য ব্যবহার করা উচিত ছিল, কিংবা ভাববে যে সে এত তুচ্ছ যে তার ঝগড়ারও কোনো মূল্য নেই; আবার প্রতিবাদ করলে সে ভাবে যে তাকে ভুল বুঝা হয়েছে, তার মনের কথাটা কেউ বুঝতে চায় না। সুতরাং তার দুর্ব্যবহারকে *তার* কাছে মর্যাদাপূর্ণ ক'রে তোলার জন্য আমি দৃশ্যমানভাবে আহত হতে শিখলাম। কষ্ট পেয়ে ছটফট করতাম। মাথার চুলত ছিড়তাম। দেয়ালে মাথা কুটতাম। তাতে সে তার ঝগড়াকে সার্থক মনে করত। কিন্তু *কোনো বিষয়ের সার্থকতা ঐ বিষয়ের প্রতি মানুষের মনোভাবকে পাল্টে দেয়।* নারীর ক্ষেত্রে কথাটা জঘন্যভাবে সত্য। শুধু সার্থকতায় তার আর পোষাল না, সার্থকতা এক পর্যায়ে তার নেশায় পরিণত হয়ে গেল। একটা-দুটো মুখের কথা দিয়ে যদি একটা মানুষকে চুল ছেড়ানো যায়, মাথা কোটানো যায়, কাঁদানো যায়, তাহলে তো তা খুব মজার ঘটনা। তাতে এক চমৎকার নেতৃত্বের স্বাদ পাওয়া যায়, নিজেকে অসীম ক্ষমতাবান ভাবা যায়। নারী নিজের মূল্য নির্ধারণ করতে শেখে তার নারীত্ব বা সৌন্দর্য দিয়ে নয়—সুন্দর কাকে বলে তা সে নিজেও জানে না, যার কারণে শাড়িটা কেমন হয়েছে তা তাকে জেনে নিতে হয় অপরের কাছ থেকে—বরং সেই সৌন্দর্য কতটা শক্তিশালী তা থেকে। তার সৌন্দর্য পুরুষকে নাচাতে পারে ব'লেই সে নিজেকে সুন্দর ভাবতে পারে। এ কারণেই সুন্দরী প্রেমিকা আত্মনিবেদিত প্রেমিককে প্রস্তাব দিয়ে বসে, 'আমাকে তুমি কত ভালোবাস তার প্রমাণ দিতে গিয়ে তুমি কি তোমার মায়ের মাথাটা কেটে আনতে পারবে কিংবা ঐ মগডাল থেকে লাফিয়ে

পড়তে পারবে?' এই মানসিকতা ফজিলাকে ক্ষমতা-সচেতন ক'রে তুলেছিল। আমি তার ক্ষমতার সার্থকতাকে তার কাছে তুলে ধরার জন্য কাপুরুষ হতে শিখলাম। ফজিলা এখন আমাকে ছাড়াও পার্টিতে যায়, স্বল্প-পরিচিত বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। অবশ্য তার চলাফেরার মধ্যে রুটিন-ভাঙা উন্মাদনা ছিল না। সময় মতো বাসায় ফিরে আসত।

আসলে সে ছিল অত্যন্ত বোকা। সে ভাবত যে অন্যেরা তাকে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসে ও কদর করে, এবং তার মতো একজন দিগ্বিজয়ী নারীর মন বুঝি না শুধু আমি। এই কারণে তার সাথে আমার আন্তরিক সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ছিল।

এক দিন ঘটে গেল চরম ঘটনাটা। তখন রোকনের বয়স প্রায় এক বছর। তার এক পরিচিত পুরুষ বন্ধু আলাপচারিতার ফাঁকে তার হাতটা ধ'রে হাতে একটা চুমু খেল। সে তাতে বিচলিত হলো। পিছুটান দিল। কিন্তু শেষমেষ নিজেকে বাঁচাতে পারল না। লোকটার স্ত্রীর সহযোগিতায় সে তাকে পটিয়ে ফেলল। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বুঝানো হলো যে 'বন্ধুত্ব কোনো দোষের কিছু নয়, তা হলো মুক্তির জলে মনটাকে স্নান করানো।' সে অসহায়ের মতো বড় অসময়ে সর্পদষ্ট হলো। অন্য শয্যার বিষ সে নিয়ে এল ঘরে। সে তখন দিগ্‌ভ্রান্ত।

তার মর্মপীড়া শুরু হলো সেই রাতেই। তার হাবভাব দেখেই আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম যে কোনো অঘটন ঘটেছে। আমার সমস্ত দেহ-মন থমথমে হয়ে গেল। আমি আমার সবকিছু হারালাম।

আমি আরো নিরব নিথর হয়ে গেলাম গোপন কৌশলে প্রকৃত ঘটনা জেনে। তবে কাপুরুষই র'য়ে গেলাম। কারণ আমার একটা সন্তান হয়েছে। আমি ঘর ভাঙতে চাইনি। তাছাড়া আমার প্রতি তার আক্রোশের কারণেই আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলাম। সেই কৃতজ্ঞতাই আমাদের বৈবাহিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রেখেছে।

সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সে যে জ্ঞানটুকু অর্জন করেছিল, তাকে সে কিছুটা কাজে খাটাতে চেয়েছিল। সেই লোকটার সাথে সে সম্পর্ক ঠিকই বজায় রাকল, তবে চুক্তির মাধ্যমে। সে তাকে বলল, 'আমরা বন্ধু হিসেবেই থাকব, তবে সামাজিকভাবে, বিছানায় নয়। মুক্তির জলে একবার স্নান করাই যথেষ্ট।' লোকটা তা মেনেও নিল।

কারণ তার আশা ছিল যে সব নৈকট্যের চরম পরিণতি ঘটবে আবারও শয্যাযাপনে। তবে ফজিলার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ নেয়া। সে আমাকে এক দিন সেই লোকটার স্ত্রল সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। সে বিভিন্ন কৌশলে এবং আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে মহিলার সাথে আমার সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তার উপস্থিতিতে ফজিলা অতি-ব্যক্তিগত কৌতুকপূর্ণ গল্প-মন্তব্যও করত—উদ্দেশ্য ঐ মহিলার সাথে আমার সম্পর্ককে ব্যক্তিগত উষ্ণতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। এমনকি আমাদেরকে গল্পরত অবস্থায় রেখে সে দীঘ সময়ের জন্য অন্য কাজেও চ'লে যেত। কিন্তু আমি সচেতনভাবেই আজীবন নিজেকে কলুষমুক্ত রেখেছি। ছোটবেলা থেকেই আমি বিশ্বাস করতাম যে *সতীত্বের ধারণা শুধু নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, তা পুরুষের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। পুরুষরা ব্যাপারটাকে এভাবে ভাবেনি ব'লে 'সতীত্ব' শব্দটার কোনো পুরুষবাচক প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করেনি।* ফলে একই শব্দ দিয়ে পুরুষ ও নারীর উভয়ের পবিত্রতাকেই বুঝানো উচতি। এত কষ্ট ক'রেই যখন নিজেকে নিরাপদ রাখতে পেরেছি, তখন এই রাজনৈতিক কারণে আমি কেন নিজের নীতির বিরুদ্ধে একটা পদক্ষেপ নিতে যাব। তাছাড়া ততদিনে নারীর প্রতি আমার একটা ব্যক্তিগত ঘৃণা জন্মে গেছে। আমি ফজিলার এবারের পদক্ষেপটাকে আর সফল হতে দিতে পারলাম না।

অনেক চেষ্টা ক'রে সে যখন ব্যর্থ হলো, তখন সে হতাশ হলো। পার্টি-বেড়ানো ছেড়ে দিল। সংসারে মন ঢেলে দিল। বিবেক যন্ত্রণায় ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যেতে লাগল। যদি সে আমাকে সেই মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত করাতে পারত তাহলে তাকে এত বিবেক যন্ত্রণায় ভুগতে হতো না। কিন্তু আমার সততা এবং নিরবতা তার জন্য নিদারুণ যন্ত্রণার চিতা হয়ে জ্ব'লে উঠল। তার আগুনে সে কিছুকাল নিরবে-নিভৃতে পুড়ল। এবং তারপর মনে মনে সে তার দুর্ভাগ্যের সব দোষ আমার ওপর চাপাল এবং তখন থেকে সে সমস্ত আক্রোশ ঝাড়তে লাগল আমার ওপর। আমাকে সে জোরে-সোরে কাপুরুষ ব'লে আখ্যঅয়িত করতে শুরু করল। তার আক্রোশ, আমি কেন তাকে আগে-ভাগে ঠেকাইনি। *কেন তাকে ভুল করতে দিলাম।* এবং ভুলের পর অন্তত তাকে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিলাম না কেন? কেন আমিও সেই লোকটার স্ত্রীকে ভোগ ক'রে অপরাধের বিচারে তার কাতারে নেমে এলাম না।

সেই থেকে ফজিলার সাথে আমার সম্পর্ক আর নোতুন ক'রে তৈরি হয়নি। নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজনে মাঝে-মধ্যে দাম্পত্য উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠ হয়েছি। আমি তাকে

কোনো দিন ক্ষমা করতে পারিনি। সেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি। তবে দশ-বার বছর পর এক বার চেষ্টা করেছিলাম তার সাথে সহজ হতে। কিন্তু তাতে তার বিবেক যন্ত্রণা এবং বিগত দিনগুলোর হারিয়ে যাওয়ার আক্ষেপ ছাই চাপা আগুনের মতো জ্ব'লে উঠেছিল। আর স্বাভাবিক হতে পারল না সে। অপরপক্ষে আমি ক্রমে ক্রমে সন্যাসব্রত অবলম্বন করতে শুরু করলাম। এবং প্রতিশোধ নেয়া শুরু করলাম—তার সব গালমন্দ এবং রূঢ় কথা আমি যে-কানে শুনতাম সেই কান দিয়েই বের ক'রে দিতাম। তাতে তার কী অবস্থা হয় তা তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছ। ওটাই আমার প্রতিশোধ।

আরো কিছু কাল পরে আরেকটা পদক্ষেপ নিলাম। তার সেই বন্ধুটার সাথে পরিচিত হলাম এবং খুব মধুর অথচ কৃত্রিম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করলাম, এবং ফজিলাকে তা জানারও সুযোগ দিলাম। সে তখন কয়েকটা সন্তানের বাবা। মনটাও পাল্টে গেছে। আগের মতো নেই। ফলে তাকে কোনোদিন বাসায় আনতে পারিনি। অবশ্য টের পেতাম যে তার স্ত্রী আমার ওপর খুব আসক্ত ছিল। কিন্তু আমি তার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতাম। লোকটাকে আমি স্বাভাবিকভাবে বন্ধু হিসেবে নিয়েছি দেখে ফজিলার মনের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানতে পারিনি। কারণ তার মধ্যে পরবর্তীতে আমি আর কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি।

আমি এখন জীবনের শেষপ্রান্তে। ফজিলার শূন্যতার জন্য আমিও অনেকখানি দায়ী। তার স্বভাবের ওপর আমার কোনো হস্তক্ষেপ ছিল না ঠিকই, তবে আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে তাকে সাহায্য ক'রে তাকে আবারও সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করতে পারিনি—হয়তো পাপের ভয়ে নয়, এক জাতীয় বিতৃষ্ণার কারণে। তার মতো একটা মেয়ের মর্মপীড়া এতটা প্রবল না হলেও চলত; আসলে আমার মাত্রাতিরিক্ত সততাই তার বিবেক যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি তার মানসিক শান্তির জন্য দোয়া করি।

আমার শ্বশুরের চিঠি প'ড়ে আমি এক গূঢ় অপ্রিয় সত্যকে জানলাম। বাপের বাড়ি থাকলাম প্রায় দুই মাস। তার মধ্যে ডিগ্রী পরীক্ষার ফল বের হলো। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। আমার মতো একটা মেয়ের জন্য তা এক অসাধারণ পাওয়া। তবুও তা আমার জীবনে বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। মেয়েরা তাদের জীবনের সার্থকতাকে শুধু বিবাহিত জীবনের সফলতা দ্বারাই মাপে। কিন্তু তারা খুব কম সময়েই

ভেবে থাকে যে বিয়েকে টিকিয়ে রাখা মানেই বিয়ের সাথকতা নয়। ভাবছিলাম এই জীবন আমার জন্য আদৌ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু কি না। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ভাবতে প্রবৃত্ত হলাম, হয়তো বা এই জীবনের মধ্যেও অন্য কোনো জীবন লুকিয়ে থাকতে পারে। সুতরাং ডিভোর্সের চিন্তা মাথায় এনেও নির্বিকার রইলাম। ইতোমধ্যে আমার স্বামী বেশ কয়েকবার এসেছেন আমাকে নিয়ে যেতে। আমি আজ-না-কাল ক'রে ক'রে শুধু ছুটির মেয়াদ বাড়াতে লাগলাম।

কয়েক দিনের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখলাম। আমার শ্বশুর আমাকে ডেকে বলছেন, 'বউমা, তোমার বাবাই ছিল সেই ঘটনার নায়ক।'

আমি স্বপ্নের মধ্যে আপাদমস্তক ঘেমে প্রচণ্ড ক্লান্তিতে জেগে উঠলাম। তাহলে এ কি সত্য? কিন্তু আমি আমার বাব-মা কে কী ক'রে জিজ্ঞাসা করব? হতেও তো পারে যে এসব সত্য। এবং সেই প্রতিশোধ নেয়ার দ্বিতীয় উদ্যোগ হিসেবে আমার শাশুড়ি তার ছেলের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন। আমার বাবাকে আর সবাই যত বিশ্বাস করে তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি আমি। কারন আমি তাঁর সন্তান। কিন্তু তাঁকে কি পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্যভাবে নিষ্পাপ ভাবতে হবে শুধু এ কারণেই যে তিনি আমার বাবা? এমনও তো হতে পারে যে বাবারা সন্তানের প্রশ্ন এবং সন্দেহের আক্রমণ থেকে স্বাভাবিকভাবে নিরাপদ দূরত্বে থাকার সুযোগ পায় ব'লে তারা অন্ধকারের মধ্যে এমন কিছু অপরাধ ক'রে বসে যার প্রতিফল সুদূরপ্রসারী।

এই যদি সত্য হয়, তাহলে আমার মাও তো সেই চক্রান্তের একজন সহযোগী। এখন আমি কী করতে পারি? যে প্রতিশোধ আপতিত হওয়ার কথা আমার মায়ের ওাপর, তা কি তাহলে আমার ওপর পড়ছে না? এ কি দুর্ভাগ! *কেন আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা প্রত্যেকেই বর্তমানের বা ভবিষ্যতের এক জন মা কিংবা বাবা, এবং আমাদের কিছু কিছু অপরাধ সেই মা কিংবা বাবার জন্য অবমাননাকর হবে? অপরাধ করার সময়ে কেউ নিজেকে ভবিষ্যতের কাঠগড়ায় একবার দাঁড় করিয়ে দ্যাখে না কেন?*

কখনো কখনো বাবার জন্য সহানুভূতি অনুভব করতাম। আমার বাবা যে-অপরাধ করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত তিনি করতে চেয়েছেন রোকনের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমার মা? *তিনি কি প্রায়শ্চিত্ত করছেন, নাকি উপভোগ করছেন?* আমার মনে হতে লাগল, আমার বাবাকে কুকর্মে সাহায্য ক'রে তিনি বিজয়ের আনন্দ

পেয়েছিলেন। মেয়েরা কখনও তাদের স্বামীর ভাগ কাউকে দিতে চায় না। কিন্তু কখনো কখনো তারা চায় যে তাদের স্বামীরা অন্যান্য জায়গা থেকে ভাগ পাক, তবে মনটা না দিক। এ হলো অন্যান্য মেয়েদের প্রতি তাদের স্বভাবগত হিংসার এবং আক্রোশের ফলশ্রুতি। প্রত্যেকটা মেয়েই চায় যে পৃথিবীর—কিংবা অন্তত চেনা-জানা পরিসরের—সব পুরুষ তার প্রতি অনুরক্ত থাকুক। কিন্তু কার্যত তা সম্ভব হয় না ব'লে তারা তাদের নিজ নিজ স্বামীর মধ্যে অন্যান্য সব পুরুষের উপস্থিতি কল্পনা করে। অর্থাৎ কোনো মেয়ে ভাবতে চায় যে তার স্বামীই তার জানা-শোনা ভুবনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ তার মতো বিশেষ এক জন মেয়েকে পাবার যোগ্যতা এবং অধিকার আছে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষটারই। কিন্তু সে যদি কেখনও দেখতে পায় যে তার মাপকাঠি অনুসারে অন্য কোনো মেয়ের স্বামী 'আরো সর্বশ্রেষ্ঠ', তাহলে সে মনে মনে সেই পুরুষটাকে জয় করতে চায়। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে সে তা করতে চায় সেই ব্যক্তিটার ওপর নিজের স্বামীর আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে। এই জাতীয় আধিপত্য কেবল নিজের স্বামীর দ্বারা ঐ লোকটার স্ত্রীর সর্বস্ব লুট করানোর মাধ্যমেই বিস্তার করা সম্ভব। আমার মা সম্ভবত তাই করেছিলেন। তাতে তিনি বিজয়ের আনন্দ পেয়েছিলেন। সব পুরুষকে বিলুপ্ত ক'রে নিজের স্বামীর মধ্যে প্রবিষ্ট করানো যখন সম্ভব হয় না, তখন কোনো মেয়ে চায় সব মেয়েকে বিলুপ্ত ক'রে সব পুরুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করাতে, কিংবা অন্তত মেয়ে হিসেবে একাই টিকে থাকতে। সম্ভবত আমার শাশুড়ি কথাপ্রসঙ্গে আমার মায়ের সামনে তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন, মেয়েরা অন্য মেয়েদের শোনানোর জন্য যা করে—এমনকি নিজের স্বামীকে তার পছন্দ না হলেও—এবং তাতে আমার মায়ের ইগোতে খুব লেগেছিল। হয়তো তিনি চেয়েছিলেন আমার শ্বশুরের সাথে পরিচিত হতে। কিন্তু আমার শাশুড়ি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তিনি এতই ব্যক্তিত্বপূর্ণ যে সচরাচর মেয়েদের সাথে খোলামেলাভাবে মেলামেশা করেন না। তাতে তাঁর আত্মসম্মানে খুব লেগেছিল। এবং এ কারণে তিনি তাঁর স্বামীকে পটিয়ে আমার শাশুড়ির ওপর তাঁকে শুধুমাত্র দৈহিকভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন। *কোনো মেয়ের স্বামী যদি আর দশটা মেয়েকে ভোগ করে, এবং মনটা দেয় শুধু তাকেই, তাহলে মেয়েটা এক জাতীয় বিজয়ের আনন্দই পায়।* আর সেই ভুক্ত মেয়েগুলো যদি হয় বিবাহিতা, এবং বিশেষত সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের স্ত্রী, তাহলে সে তাকে মনে করে মহা বিজয়। সে যদি জানে যে যারা তার স্বামীর দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে তারা জানে যে সে তা জানে, তাহলে সে নিজেকে রাণী

মনে করে। *রাজা আর দশটা রক্ষিতাকে ভোগ করলে রাণীর তাতে গৌরব বাড়ে।* রাণীর শুধু শর্ত থাকে এটাই যে প্রেমটুকু দিতে হবে শুধু তাঁকে। রক্ষিতাকে ভোগ করা যাবে কিন্তু সম্মান করা যাবে না, ভালোবাসা যাবে না। তাদেরকে তাদেরকে স্রেফ ভোগ্যবস্তু ভাবতে হবে। এই বিজয়ের আনন্দ পাওয়ার পর আমার মা দেখলেন যে তিনি একই সাথে বিজয়ী এবং পরাজিত—পরাজিত এজন্য যে একটা মেয়ে তাঁর স্বামীর মতো বিখ্যাত স্বামীকে পেল, অথচ তাঁর মতো দিগ্বিজয়ী একজন রমণী সেই মেয়েটার স্বামীর মতো সাধারণ একজন মানুষকে পেল না? *যে-কোনো অস্বাভাবিক জয়ের সাথে কোনো-না-কোনো ভাবে পরাজয় জড়িয়ে থাকে। তার মুখোমুখি হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার।* আমার মা তাই আমার শাশুড়ির মাধ্যমে পরিচিত হলেন আমার শ্বশুরের সাথে। এটা ছিল তার স্বামী হারাবার খেসারত আদায় করার প্রচেষ্টা। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হবার পর সেই প্রচেষ্টাকে দীর্ঘমেয়াদী শক্তি দান করলেন এবং অবশেষে রোকনের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। যাকে তিনি প্রতিযোগিতায় হারাতে পারেরননি, তার ছেলেকে হারিয়ে তিনি তার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সে কাজে তিনি নিজে সশরীরে অবতীর্ণ না হয়ে তার আদরের মেয়েটাকে ব্যবহার করেছেন। *তাহলে কি আমার মা আমার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চান?* তা না হলে তিনি আমাকে বারবার রোকনের কাছে ফিরে যেতে বলেন কেন? তা না হলে রোকন মাঝে মধ্যে ফিরে যাবার ব্যাপারে আমার মতামত জানতে এলে মা তাকে আমাদের সংসারে কিছুকাল থেকে যেতে বলেন কেন? এবং তাহলে কি আমার মা আমার মধ্যে ঢুকে প'ড়ে রোকনের মধ্যে আমার শ্বশুরকে খুঁজতে চান? আমার চিন্তাশক্তি রহতি হয়ে যেতে লাগল।

মায়ের ওপর চাপা ক্ষোপ সৃষ্টি হলো আমার। বাবার ওপরও। কিন্তু প্রকাশ করলাম না। অতীতকে আমরা পাল্টাতে পারি না। ভুলতেও পারি না। *আমরা অতীতকে ভুলতে পারি তখন যখন বর্তমানকেও অতীতের মতো ক'রে গ'ড়ে নিতে চাই এবং নিতে পারি।* তাহলে কি বর্তমান আর অতীতের মধ্যে কোনো বিভেদ রাখা চলবে না? কিন্তু তা করতে হলে তো আমার শাশুড়িকে আর দোষী ভাবা ঠিক হবে না। আবার আমার বর্তমানের জন্য যে-অতীত দায়ী, তা তো *আমার* অতীত নয়। এক জন তার বর্তমানকে তার নিয়মে মধুর করতে গিয়ে কিছু ঘটনাকে তামাশাচ্ছলে অতীতের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে, আর আমি অসহায়ের মতো আমার বর্তমানকেও তার সেই গহ্বরের দিকে হারাচ্ছি। এক জন তার নিজস্ব নিয়মে ফাঁদ পেতে রেখেছে, আর আমি

তাতে বারবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আটকে যাচ্ছি। কে বুঝবে আমার অসহায়ত্ব? আমার ভাগ্যলিপি লেখা হয়েছে অপরের ভাষা ও যুক্তি দিয়ে।

আমার অনুভূতি এবং জীবনবোধ একটা আত্মবিরোধের চক্রের মধ্যে আটকে গেল। অনুভূতি যখন আত্মবিরোধ হয়ে ওঠে, তখন তা শুধু অনুভূতির স্তরে সীমিত থাকে না, বোধ এবং যুক্তির পর্যায়ে উঠে আসে। তার ফলেই শুরু হয় অর্থ অনুসন্ধানের পালা। আমি এখন সব কিছুর মধ্যে অর্থহীনতাই খুঁজে পাচ্ছি।

এদিকে আমার শাশুড়ি বারবার রোকনকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আমার সাথে রাত্রিযাপন করার জন্য এবং আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। আমি তাঁর কোনো প্রস্তাবেই রাজি হতে পারছিলাম না। তার ফলে আমার শ্বশুরবাড়ির অশান্তি চ'লে এল বাপের বাড়ি—আমি স্বামীশয্যা গ্রহণ করছি না দেখে আমার বাবা স্ত্রীশয্যা ত্যাগ করলেন। এবার শুরু হলো আমার প্রতিশোধ। আমি চাচ্ছিলাম আমার মতো আমার মাও রোজা রাখুক। আমার ভয় হচ্ছিল, আমি স্বামীশয্যায় গেলে আমার মা আবার সেই শয্যার সাথে বিলীন হয়ে থাকেন কি না। মাকে কেইবা হারাতে চায়? মায়ের বিকল্পের মধ্যে মা থাকে, কিন্তু বাবার বিকল্পের উদ্ভব ঘটলে আর মায়ের অস্তিত্ব থাকে না। যে-মেয়ের মা নেই, সে তার স্বামীর মধ্যে বাবার ছায়ার উপস্থিতির ভয়ে সংসার থেকে দূরে থাকতে চায়। পৃথিবীতে মাতৃগর্ভের বাইরে টিউবে 'উৎপাদিত' মেয়ের সংখ্যা যদি বেড়ে যায়, তাহলে মেয়েদের সংসারমুখিতাও ক'মে যাবে। তখন সংসার বিলুপ্ত হতে থাকবে, থাকবে শুধু যৌনতা। যে-যৌনতার কোনো আনুষ্ঠানিক পরিচয় নেই, তার মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিকতা নেই, তা পাশবিক যৌনতা। পশুর এবং মানুষের যৌনতার মূল পার্থক্য এখানেই যে তার জন্য পশুর কোনো আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না, অথচ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া মানুষ যৌনতার সাথে বংশবৃদ্ধির কামনাকে মিলাতে পারে না। যৌনতা শুধু একটা ক্রিয়া নয়, তা একটা প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি। তাতে কী করতে হবে তা ঠিক করার আগে বিবেচনা করতে হয় তা কিভাবে করতে হবে। যৌনতার পক্ষে আনুষ্ঠানিক অনুমতি যৌনতাকে বৈধ ক'রে তোলে। আমরা তাকেই বলি বিবাহ। যৌনতার এই বৈধ উদ্বোধনী আয়োজন আসলে একটা গোপন বিষয়কে একটা প্রকাশ্য নাম দেয়ার প্রয়াসমাত্র। গোপন যৌনতায় কেবল প্রক্রিয়াটাই বড়, ব্যক্তি গৌণ, এমনকি গুরুত্বহীন। ফলে তাতে যথাযথ শ্রেণীভেদ থাকে না। অন্ধকার নাচঘরে, বিপুল-সংখ্যক মুক্ত নরনারীর কোয়ান্টাম ঘনিষ্ঠতা হলো এক শ্রেণীবিহীন সামাজিকতার যৌন-চিতা। সেখানে সবাই সবার জন্য, কেননা সেখানে কেউ কোনো *নির্দিষ্ট* ব্যক্তির

জন্য নয়, এবং কেউ কোনো ব্যক্তিকে খোঁজেও না, খোঁজে কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে। সুস্থ যৌনতা কখনও ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এ কারণে মানুষের সামাজিক শ্রেণী না থাক, যৌনতার শ্রেণী থাকতেই হবে। মায়ের হাত ধ'রে ছেলে যদি অন্ধকার নাচঘরে রাত কাটাত, তাহলে সেই ছেলে আলোর ভূবনে উঠে এসে কখনও বাবা হতে পারত না। বাবা হওয়াটা একটা প্রকাশ্য ব্যাপার। গোপনে বাবা হবার কোনো নিয়ম কোনো সমাজে নেই। আবার পাশ্চাত্যের সাগর সৈকতগুলোর রং-চটা আলোর মধ্যে সংঘটিত যে শ্রেণীহীন 'আসলেই পাবেন' ভিত্তিক যৌনতা, তা কিন্তু প্রকাম্য নয় আদৌ। তা গুপ্ত—এত গুপ্ত যে প্রখর আলোর মধ্যেও বাহুলগ্ন সঙ্গীনিটা জানে না সে কার সঙ্গ লাভ করছে। সে যৌনতার কোনো পরিচয় নেই। তাতে বাহুর মধ্যে আছে এক জন, অথচ মনের মধ্যে আছে অন্য কেউ। প্রকাশিত হবার দাবিদার কেবল যৌনতার *পরিচয়টা*, তার *প্রক্রিয়াটা* নয়। আমি ইতিমধ্যে যৌনতার প্রক্রিয়াটাকে ভয় পেতে শিখেছি। আমার শাশুড়ি আমার যৌনতাকে চাননি, চেয়েছেন তার একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকে। আমি এখন কী করি?

একদিন আমার স্বামী এসে আমার পা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে পড়ল, 'তুমি আমার সাথে চল, পরী। তুমি ছাড়া বাড়িটা শূন্য লাগছে। আমি তোমাকে ভালোবাসি, পরী।'

মানুষ হিসেবে আমার স্বামীকে আমি কখনও খারাপ বলতে পারব না। কিন্তু তবুও সেই মুহূর্তে তার ঘরে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি বললাম, 'আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাস। এবং আমি এটাও বিশ্বাস করি যে তুমিও জান যে আমি তোমাকে ভালোবাসি। পৃথিবীর অধিকাংশ মেয়ের এই আত্মবিশ্বাসটা নেই, তবে আমার আছে। কিন্তু আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।'

আমার কথা শুনে সে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। আমি তাকে সান্নিধ্য দিলাম। প্রবোধ দিলাম। বললাম, 'এর পর থেকে তোমার সাথে আমি আর যোগাযোগ বা সম্পর্ক রাখতে পারব না।'

'কারণ?'

'তোমাকে ভালোবাসি ব'লে।'

সে বলতে পারত, ‘সে কেমন কথা?’ কিন্তু সে মুখে কোনো কথাই বলেনি। শুধু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধ’রে কেঁদেছে। খানিক পরে জানতে চাইল, ‘কোনোভাবেই না?’

‘একটা মাত্র উপায় আছে।’

‘কী উপায়?’

‘আমাকে তোমার ডিভোর্স দিতে হবে।’

শুনে সে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কিন্তু অনেক চেষ্টা ক’রে আমি তাকে বুঝাতে পারলাম, ‘তুমি তো জান বিগত দিনগুলোতে তোমাদের বাসায় আমি কী অবস্থায় বেঁচে ছিলাম। কিন্তু তুমি জান না তার মূল কারণ কী।’

‘তুমি জান?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে আমাকে বল, প্লিজ।’

সে আবারও আমর পা জড়িয়ে ধরল। মেয়েরা স্বামীর পা জড়িয়ে ধরাটাকে খুব বিব্রতকর একটা পরিস্থিতি ব’লে মনে করে। কারণ তাতে তারা এত খুশি হয় যে সে খুশির অনুভূতিকে ব্যবহারিক কাজে লাগাতে পারে না, কল্পনার জগতে নিয়ে যায়। মেয়েরা এরকম স্বপ্নের স্টাইলে খুশি হতে চায় কেবল স্বামী সহবাসের সময়ে। অন্যান্য সময়ে তারা বাস্তবতার প্রথাসিদ্ধ কাঠামোটাকে ধ’রে রাখতে চায়। আমি অনেক মেয়ের কথা জানি যাদেরকে তাদের স্বামীরা বিশেষ ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে পায়ের তলায় চুমু দিলে তারা হৃদয়টাকে একেবারে মেলে ধরে। এমনকি এক মহিলার যৌন অক্ষমতাকেও তার স্বামী এই কৌশলে সমাধান করেছিল ব’লে জানি। এর সঙ্গত কারণ আছে। স্বামী যখন কোনো মেয়ের পায়ে সোহাগমিশ্রিত দুয়েকটা চুমু দেয়, তকন সেই মেয়েটা নিজেকে তার স্বামীর মায়ের সমতুল্য বা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবতে সুবিধা পায়। এই প্রসাদ পেয়ে তার মানসিক জটলা মুহূর্তের জন্য খুলে যায়, সে হৃদয়টাকে গোলাপের মতো মেলে ধরে। কোনো মেয়েরই নিজের যৌবনের এবং মনের এবং রূপের মর্যাদা ও শক্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাস নেই। অথচ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে মেয়েরা

সদা-উন্মাদ। এই আত্মবিশ্বাস তারা অর্জন করতে পারে নিজেদেরকে নিজ নিজ স্বামীর মায়ের স্থানে বসাতে পারলে। নির্ভেজাল যৌনতা নারীর নেই। তার যৌনতার পেছনে থাকে বিভিন্ন মোচড়, বিবিন্ন ক্রস-কানেকশন, বিভিন্ন ক্রস-রেফারেন্স, বিভিন্ন জটিলতা। অবশ্য এর সমাধান আছে, এবং নির্ভেজাল আনন্দের উৎসের সন্ধানও নারীর পক্ষে পাওয়া সম্ভব। তবে সে ব্যাপারে আমি কথা বলব অন্য কোনো এক দিন। যাহোক, আমার স্বামীকে পায়ের কাছ থেকে আমি আবারও বুকে স্থান দিলাম। বললাম, 'আমি যা জানি, তা কোনো তথ্য নয়, তা হলো আমার নিজস্ব চিন্তার ফসল। তা জানলে তোমার ক্ষতি হবে। তোমার তা জানার দরকারও নেই। তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তুমি যদি আমাকে ডিভোর্স দাও, তাহলে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক চিরকালের জন্য পাকাপোক্ত হয়ে যাবে।'

'কিভাবে?'

'সেটাও আমি জানি।'

অবশেষে সে আমাকে ডিভোর্স দিতে বাদ্য হলো।

তাৎক্ষণিকবাবে আমি এক বিপুল আনন্দের সমুদ্রে ভেসে গেলাম। এক সপ্তাহ কাটালাম বোনের বাড়ি মামার বাড়ি বেড়িয়ে।

তার পর ছয় সাত মাসের মধ্যে রোকন আমার কাছে আসেনি। আমিও ইতিমধ্যে এম. এ. তে ভর্তি হয়েছি। হঠাৎ এক দিন ভার্সিটিতে আমার ননদ দীপার সাথে দেখা। তারও বিয়ে হয়ে গেছে। তার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ তত্য পেলাম—রোকন বিয়ে করেছে।

শুনে তেমন খারাপ লাগেনি আমার। তবে একটু কষ্ট পেয়েছিলাম, যার উৎস রোকন নয়, আমারই মন। কিন্তু আমি যা ভেবেছিলাম তা-ই জানতে পারলাম—সে এখনও আমাকে ভালোবাসে। এমনকি তার প্ররোচনায় তার স্ত্রীও আমাকে ভালোবাসে! আনন্দে আমার সারা শরীর শিরশির ক'রে উঠল। আমার জীবনকে স্বাভাবিক ক'রে তোলার এটাই তো উৎকৃষ্ট উপায়।

আরো জানলাম যে রোকনের বউ খুব কোমল—দেহে এবং মনে। আমার শাশুড়ি তাকে আদর ক'রে নাম দিয়েছেন 'পরী'।

আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে এখন বিছানায় রোকন পুরুষ হয়ে উঠেছে। আমার শাশুড়িও একন এক জন সুপুরুষের মা। সুপুরুষের স্ত্রী হবার যোগ্যতা তাঁর না হলেও সে কষ্ট এখন আর তাঁর কাছে বড় নয়।

রাতে টেলিফোনে রোকনের সাথে আলাপ হলো। পরদিন বাসায় আসতে বললাম। সে তার সব কাজ ফেলে দিয়ে আমার জন্য এক গাদা উপহার নিয়ে সকালে চ'লে এল। সারাদিন আমরা এক ঘরে অবৈধভাবে কাটালাম।

আমার মায়ের ওপর আমি চরম প্রতিশোধ নিলাম। তাৎক্ষণিকভাবে তার মুখ ধুলো হয়ে গেল।

আমার আচরণ দেকে বাবার স্মৃতির ফোঁড়াটা পেকে টনটন ক'রে উঠল। সেই ব্যথা সারাতে কিংবা হয়তো ফোঁড়াটাকে ফাটাতে তিনি ক'দিনের জন্য ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গেলেন।

কিন্তু মা ঢাকাতেই থাকলেন। এই ভাবে রোকন পর পর পাঁচ দিন আমার সাথে কাটাল। তারপর তাকে আসতে নিষেধ করলাম।

রোকনের পুনরাবির্ভাব দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'রোকনের ঘরে কি তাহলে আবার ফিরে যাচ্ছিস?'

সরাসরি জবাব দিলাম, 'না।'

মা আর কোনো কথা বললেন না।

দিন পনর পর রোকনের বউ বাপের বাড়ি বেড়াতে গেলে তার বাসায় গেলাম। এখন বাসায় তার মা আর সে ছাড়া আর কেউ নেই।

আমি সেখানে সারাদিন তার সাথে 'রাত কাটালাম'।

তার মা আমাকে প্রচণ্ডভাবে আদর আপ্যায়ন করলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ ধ'রে আমি তাদের বাসায় যাওয়া-আসা করলাম।

অবশেষে রোকনের মা আমার সামনেই রোকনকে বললেন, 'নোতুন পরীকে তালাক দে।'

আমি সে ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না ক'রে বাসায় ফিরে গেলাম।

কয়েকদিন পর রোকন এসে প্রস্তাব দিল, 'চল আবার বিয়ে করি।'

তদন্ত করলাম, 'নোতুন পরীকে তালাক দিয়েছ?'

'আজ-কালের মধ্যেই দিয়ে দিব।'

'কষ্ট হবে না?'

একটু তেমে সে বলল, 'হবে।'

'কিন্তু যদি আমি তোমাকে বিয়ে না করতে চাই?'

'জীবনের সবচেয়ে বড় কষ্টটা পাব।'

'আমি যদি একটা শর্ত দেই?'

'মেনে নেব।'

'নোতুন পরীকে তালাক দেয়া চলবে না।'

'কারণ?'

'কারণ সে আমারই এক অংশ।'

'খানিক ভেবে, 'কিভাবে?'

'তা তুমি বুঝবে না।'

‘রাজি।’

‘কিন্তু সে কি আমাকে মেনে নেবে?’

‘নিয়েছে।’

‘মানে?’

‘তোমার সাথে আমার ছাড়াছাড়ির ব্যাপারটা সে জানে না। সে জানে যে তার সতীন আছে, তবে সে দূরে থাকে।’

‘জেনেও বিয়েতে রাজি হলো কেন?’

‘তার কোনো দিন সন্তান হবে না।’

‘তা জেনেও তুমি তাকে বিয়ে করলে কেন?’

‘তোমাকে ফিরে পাব তা জানতাম।’

‘বিয়ের পর আমি কোথায় থাকব?’

‘আমার কাছে।’

‘আর নোতুন পরী?’

‘তোমার কাছে।’

‘কেন?’

‘সে তোমার এক্সটেনশন।’

‘কিভাবে বুঝলে?’

‘তুমিই তো বললে।’

রোকন ঠিকই বুঝেছে। তথ্য না জেনেও যে জ্ঞান অর্জন করা যায়, তার প্রমাণ পেলাম তার কথা থেকে। আসলে, নোতুন পরীর গুরুত্ব রোকনের কাছে যতটুকু, তার

চেয়ে বেশি আমার কাছে। শুধু তাই নয়, নোতুন পরীর কাছেও রোকনের চেয়ে আমার গুরুত্বই বেশি।

আমি আবার আমার ঘরে ফিরে গেলাম।

আমি দুঃখিত যে আমার সব প্রশ্নের জবাবা আমি দিতে পারিনি। আসলে নারীর মন সম্বন্ধে আমার প্রকৃত ধারণা জন্মেছিল আরো পরে। সেসব ব্যাপারে অন্য কোনো এক দিন আলাপ হবে। আমার বিশ্বাস, আমার সেই সামান্য অভিজ্ঞতাকে অন্যেরা যদি নিজেদের জ্ঞানের সাথে মিলিয়ে নেয়, তাহলে, আর কিছু না হলেও, এই অভাগা দেশের সব শিক্ষিত নর-নারীর মন শান্তিতে ভ'রে যাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশ শান্তি এ দেশেই সম্ভব।"

৩

ফরিদা আপা কথা শেষ ক'রে বিদায় না জানিয়েই সোজা নেমে গেলেন। এতক্ষণ কথা বলার সময়েও তিনি কারো দিকে তাকাননি। তিনি চ'লে যাবার পর আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো মিনিট পাঁচেক ব'সে রইলাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই। খানিক পর বিরূদার দিকে তাকালাম। তাকে আবারও অস্থির দেখাচ্ছে। আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না। নিরবে চ'লে এলাম।

পরদিন ভার্সিটি ক্যাম্পাসে দুপুরের তীব্র রোদের মধ্যে ব'সে আছি। নিজের চিন্তার ভারে নিজেই অতিষ্ঠ। মনে পড়তে লাগল পরীর কথা, রূপার কাহিনী। এমন সময়ে টের পেলাম কেউ যেন আমার পাশে এসে বসল। বোরখা পরা।

চেনা মুখ।

বোরখা পরেছে!

সে চায় না কেউ তাকে পুরোপুরি চিনে ফেলুক।

চোখে শর্ষে ফুল দেখলাম। স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুখ থেকে বের হয়ে এল, "কেমন আছ রূপা?"

"কী বললে তুমি?" রিভা যেন আকাশ থেকে পড়ল, "কে সে রূপা?"

কিন্তু স্বয়ংক্রিয়তারও দ্বিতীয় ধাপ থাকতে পারে। আবারও মুখ থেকে বের হয়ে এল, "ও সরি, কেমন ছিলে, পরী?"

"পরী? পরী! তুমি আমার মুখটা দেখতে পাচ্ছ না? ...ও, তাহলে...."

আমার ঘোর কাটল। কিন্তু তাকে বুঝাবার সুযোগ পেলাম না। সে দুই চোখ অশ্রু নিয়ে ঝামটি মেরে চ'লে গেল।

প্রথম খন্ড সমাপ্ত